জওহরলালের চিঠি

বা

পৃথিবীর ইতিহাস।

Letters from a Father to his Daughter

by

Jawaharlal Nehru

অনূদিত—

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

মূল্য ১৷৹ আনা মাত্র

আমার কথা।

টিউবারকুলোসিস্ রোগে ভুগ্‌চি। এক বন্ধু একদিন জওহরলালের Letters from a Father to his Daughter বই খানা পড়্‌তে দিলেন। বইখানা প'ড়ে ভারী ভাল লাগ্‌ল। আমাদের এই পৃথিবীর কথা, আমাদের কত চেনা কত আপনার পৃথিবী, তবু কি রহস্যময়! যুগ যুগান্তের কী রহস্য এই পৃথিবী তার বুকে লুকিয়ে রেখেচে, মানুষ খুঁজে বের ক'রতে চায় তাকে। 'হিডেলবার্গ ম্যান', 'পেকিন ম্যানকে' সে খুঁজে বের ক'রেচে, 'ডাইনোসোর', 'ম্যামথ' এদের ফসিল্ আবিষ্কার ক'রেচে; লক্ষ কোটী বছর আগের পৃথিবীর সাথে আজকের পৃথিবীর যোগসূত্র বের কর্‌বার জন্য মানুষের অনুসন্ধানের আজ আর অবধি নাই। আর মানুষের ইতিহাস, তাই বা কি বিচিত্র। সেই কত সহস্র বছর আগের গুহা-বাসী মানুষ—মানুষ নয় পশু—অনন্ত কালের পথে তার হাটি হাটি পা, তার প্রগতি, পশুত্বকে জয় করবার তার আকাঙ্ক্ষা, অজানাকে জান্‌বার তার ইচ্ছা, এইত তার সত্যিকার ইতিহাস।

জওহরলালজী চিঠি গুলি তাঁর ছোট্ট মেয়ে ইন্দিরাকে লিখেছিলেন—১৯২৮ সনের কথা। ইন্দিরার বয়স তখন দশ বৎসর। আমার বাড়ীর ভাইবোনদের পড়াবার জন্যই বই

খানা অনুবাদ করেছিলাম। রুগ্ন অবস্থায়, বই খানা অনুবাদ ক'রে বড় আনন্দ পেয়েছিলাম। আমার সেই আনন্দের একটুকু ভাগও যদি আমার দেশের, আমার স্নেহের ছোট ছোট ভাই বোনগুলিকে দিতে পারি, সেই আশাতেই জওহরলালের চিঠি প্রকাশ করলাম।

আমার যে সকল বন্ধুর উৎসাহে ও সযত্ন চেষ্টায় আমার রুগ্ন অবস্থায়ও এই বই প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল, তাদের সবাইকে আজ সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ ক'রচি। জওহরলালজী তাঁর বই খানা অনুবাদ করবার অনুমতি দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেচেন।

কুমিল্লা। } ইতি—

আশ্বিন, ১৩৪১ বাং, } শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

স্ফিংক্স একটা সিংহের বিরাট প্রস্তর মূর্তি, মাথাটা কিন্তু এর একটা মেয়ে মানুষের মুখ। এই বিরাট মূর্তিটা যে কেন তৈরী হয়েছিল আর কী সে এ বুঝাতে চায় তা কেউ বলতে পারে না। একখানা পাথর

জওহরলালের চিঠি।

একের চিঠি

প্রকৃতির শিক্ষা।

যখন তুমি আমার কাছে থাক, তুমি আমাকে প্রায়ই নানা রকমের প্রশ্ন জিজ্ঞেস কর, আমিও তার উত্তর দিতে চেষ্টা করি। এখন তুমি আছ মুস্থরী, আর আমি আছি এলাহাবাদ, আমাদের দু'জনের মধ্যে কথাবার্ত্তা কিন্তু এখন আর তেমনটি হবার যো নেই। তাই আমি ভাব্‌ছি আমাদের এই পৃথিবী, আর তার যে নানা ছোট বড় দেশ আছে, তারই গল্প তোমাকে মাঝে মাঝে চিঠিতে লিখ্‌ব। তুমিত ইংলণ্ড আর ভারতবর্ষের ইতিহাস একটু একটু পড়েছ। ইংলণ্ড কিন্তু একটি অতি ছোট্ট দ্বীপ, আর ভারতবর্ষ একটা মস্ত দেশ হ'লেও তা-ও পৃথিবীর মাত্র একটি ছোট অংশ; কাজেই পৃথিবীর কথা কিছু জান্‌তে হ'লে, কেবল আমাদের নিজেদের জন্মভূমির কথা জানলেই ত হবে না, আরও যে সব দেশ আছে, আরও যে সব জাতি আছে, তাদের কথাও আমাদের জান্‌তে হবে।

হয়তো, আমার এই চিঠিগুলিতে তোমাকে অল্প কথাই লিখ্‌তে পার্‌ব, কিন্তু অল্প হ'লেও আমার মনে হয়, এ গুলি তোমাকে আনন্দ দিবে, এবং এই মস্ত পৃথিবীটা যে একটা দেশ, আর তার সব জাতের মানুষই যে আমাদের ভাই-বোন, সেই কথাটাও তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে। বড় হ'য়ে, পৃথিবী আর তার মানুষের কথা, তুমি অনেক মোটা মোটা বইতে পড়্‌বে, সে সব কথা তোমার গল্প আর উপন্যাসের বইয়ের চেয়েও অনেক ভাল লাগ্‌বে।

তুমিত জানই আমাদের এই পৃথিবীটা মস্ত বুড়ী, বহু লক্ষ বছর হয়েছে এর বয়স। কিন্তু বহু বহু বছর আগে এর বুকে মানুষের বাসের কোন চিহ্নই ছিল না। মানুষের জন্মেরও আগে পৃথিবীতে বাস কর্‌ত নানা রকমের জন্তু, আর তারও আগে কোন রকমের প্রাণীর চিহ্নই ছিল না এই পৃথিবীতে। আজ দেখ্‌চ কত রকম মানুষ, আর জীব জন্তুতে ভরা আমাদের এই পৃথিবী ; কিন্তু এমনও এক দিন ছিল, যখন এসব কিছুই ছিল না। ভাব্‌তে ভারী অদ্ভুত ঠেকে—না ? কিন্তু বৈজ্ঞানিক আর মস্ত মস্ত পণ্ডিতেরা, যাঁরা এ নিয়ে ভেবেছেন অনেক, তাঁরা বলেন যে, পৃথিবী একদিন এত গরম ছিল যে কোন প্রাণীরই এখানে বাস করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমরা যদি তাঁদের বই পড়ি, আর নানা রকমের পাথর আর পুরাণো জীব-জন্তুর দেহাবশেষ (fossil) নিয়ে নাড়াচাড়া করি, তবে এই সত্য কথাটা আমরা নিজেরাও বুঝ্‌তে পার্‌ব।

ইতিহাসের কথা তো তুমি বইয়ে পড়েছ। কিন্তু সেই আদ্যি কালে যখন মানুষেরই জন্ম হয় নাই, তখন বই আর আস্‌বে কোথা থেকে? সেই দিনের কথা কেমন করে জানা যায় বলত? ব'সে ব'সে চিন্তা ক'রে মন গড়া গল্প বানালেই তো আর চল্‌বে না। এ রকম ভেবে ভেবে গল্প তৈরী কর্‌তে পার্‌লে কিন্তু মন্দ হ'ত না, দিব্যি নিজের মনগড়া সুন্দর সুন্দর রূপ-কথার সৃষ্টি করা যেত—কিন্তু সত্য থাক্‌ত না তার মধ্যে একটুয়ো, আর আমাদের চোখে দেখা ঘটনার সাথেও এর মিল হ'ত না কিছুই। সেই আদ্যি কালের লেখা বই আমাদের হাতে নেই সত্যি, কিন্তু তা হ'লেও আমাদের কাছে এমন সব উপাদান রয়েছে, যারা ঠিক বইয়ে লেখা ঘটনার মতই সত্য কথা বলে। জান আমাদের কাছে কি কি আছে? আমাদের কাছে আছে পাথর পাহাড়, আছে তারকা আর সমুদ্র, আছে নদী আর মরুভূমি, আর আছে প্রাচীন জীব-জন্তুর কঙ্কাল। এ-সব আর এম্‌নি ধারা আরো অনেক জিনিষ—এরাই হ'ল পৃথিবীর আদিম যুগের ইতিহাসের বই। অন্যের লেখা বই পড়াটাই পৃথিবীর কথা জান্‌বার সত্যিকার উপায় নয়। আমাদের যেতে হ'বে, প্রকৃতি-দেবীর নিজের হাতের লেখা যে একখানা বই আছে, তাই খুঁজ্‌তে। কেমন করে যে এই পাথর আর পাহাড় থেকে ইতিহাস পাঠ করা যায়, তাঁর প্রণালীটা, আশা করি, তুমি শীঘ্রই শিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌বে। ভেবে দেখত, কি আশ্চর্য্য বিস্ময়ের কথা, রাস্তার পাশে অথবা পাহাড়ের গায়ে ঐ যে

ছোট্ট পাথরের নুড়িটা পড়ে' রয়েছে, ওটাই হয়ত প্রকৃতির নিজের বইয়ের একখানা ছোট্ট পাতা! এর ভাষার 'অ, আ, ক, খ,' টা যদি তুমি শিখে নিতে পার, দেখবে ঐ পাথরের নুড়িটাও প্রকৃতির রহস্যের একটুখানি কথা তোমাকে ব'লে দিবে। হিন্দি, উর্দ্দু, ইংরেজী এ-সব ভাষার বই পড়তে হ'লে প্রথমেই সেই ভাষার বর্ণপরিচয়টা তোমার হওয়া দরকার। তেম্‌নি দেখ পাহাড় পাথরের বইতে প্রকৃতির কথা পড়্‌তে হ'লে তার পাঠশালার 'অ, আ, ক, খ'-টাও তোমাকে প্রথম শিখে নিতে হবে। হয়তো এর মধ্যেই এই বইখানা পড়বার প্রণালীটা তুমি একটু একটু শিখেছ। ভেবে দেখত, একটা চক্‌চকে গোল পাথরের নুড়ি তোমাকে কিছু বলে কি না। এমন হ'ল কি করে যে পাথরের নুড়িটার একটা কোণও বেরিয়ে নেই, একেবারে গোল; আর কেমন করেই বা এটা এত মসৃণ চক্‌চকে হ'ল যে এর একটা দিকও এবরো-থেবড়ো নয়। যদি একটা বড় পাথরকে টুক্‌রা টুক্‌রা করে ভেঙ্গে ফেল, দেখবে প্রত্যেকটা টুক্‌রাই কেমন এবরো-থেবড়ো, কোণগুলি সব বেরিয়ে আছে, ধারগুলি মোটেই সমান নয় দেখ্‌তে, একটা টুক্‌রাও সেই প্লেন পাথরের নুড়িটার মত নয়। ঠিক ঠিক যার শুন্‌বার কান আছে, আর দেখ্‌বার চোখ আছে, তাকেই এ তার জীবনের কাহিনী বল্‌বে। শুন এ কি বল্‌ছে—"সে বহু দিনের কথা আমি ছিলাম একদিন অনেক কোণ, অনেক ধারওয়ালা একটা পাথর। ঐ যে একটা টুক্‌রা বড় পাথরটার থেকে ভেঙ্গে নিয়েছ ঠিক

অম্‌নি। কি-জানি কোন্ একটা পাহাড়ের গায় পড়েছিলাম। তারপর একদিন বৃষ্টি এসে আমাকে ধুইয়ে নিয়ে গেল নীচের উপত্যকায়; সেখানে আমি পেলাম সন্ধান এক ঝরণার। ঝরণা আমাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে গেল একটা ছোট্ট নদীর মধ্যে। ছোট্ট নদীটা আমাকে সাথে করে নিয়ে গেল আরেকটা বড় নদীতে। তারপর থেকে নদীর নীচে প'ড়ে আমি অনবরত ঘুরপাক খেয়েছি, চারদিকটা আমার ক্ষয় হয়ে গেছে, এবড়ো-থেবড়ো গা-টা এখন হয়েছে মসৃণ আর চক্‌চকে। কেমন করে যেন নদীটা আমাকে পেছনে ফেলেই একদিন চলে গেল, তাই তুমি আমাকে কুড়িয়ে পেয়েছ। নদীটা যদি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেত, আমি তবে ছোট হ'তে হ'তে একদিন হ'য়ে যেতেম ছোট্ট একটা বালুকণা, আর সমুদ্র তীরে গিয়ে মিশ্‌তাম আমারই মত আমার ছোট্ট ছোট্ট ভাইগুলির সাথে। আমার সেই ভাইগুলি মিলেই তৈরী করছে সমুদ্রের বেলাভূমি যেখানে ছোট শিশুরা খেলা করে, আর বালু দিয়ে তৈরী করে তাদের খেলা-ঘর।"

তোমার চোখের সাম্‌নে যে পাথরের নুড়িটা দেখ্‌চ তার জীবনের কাহিনী এই। একটা ছোট পাথরের নুড়ির-ই দেখ বল্‌বার আছে কত কথা। এখন ভেবে দেখত বড় বড় পাষাণ পাহাড়, আর আমাদের চারদিকের সব জিনিষ থেকে আমরা কত কিছুই না শিখ্‌তে পারি!

দুইয়ের চিঠি

প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান।

আমার কাল্‌কের চিঠিতে তোমাকে লিখেছিলাম যে পৃথিবীর প্রাচীন যুগের কাহিনী জান্‌তে হ'লে আমাদের প্রকৃতি দেবীর নিজের হাতের লেখা বইখানা পড়তে হবে। এই বইখানার উপাদান কিন্তু আর কিছুই নয়, তোমার চারদিকে যে সব বস্তু দেখ্‌চ তারাই, যেমন—পাথর, পাহাড়, উপত্যকা, নদী, সমুদ্র, আগ্নেয়গিরি। এমন একখানা বই আমাদের চোখের সাম্‌নে খোলা পড়ে' আছে, সবক্ষণের জন্য; কিন্তু কয়জনেরই বা এর প্রতি মনোযোগ আছে, আর কয়জনই বা এই বই খানা পড়্‌বার চেষ্টা করে! এই বইখানা যদি আমরা পড়্‌তে আর বুঝ্‌তে পারি, কত বিস্ময়কর কাহিনী-ই না এ আমাদিগকে বলে দিবে। এর পাথরের পাতার গায় যে সব কাহিনী লেখা রয়েছে, সে সব রূপকথার গল্পের চেয়েও অনেক মজাদার।

যে দিন পৃথিবীতে মানুষ ছিল না, কোন রকমের প্রাণী ছিল না, সেই অতীত দিনের কাহিনী আমরা প্রকৃতির এই বইখানা থেকেই জান্‌তে পারি। পড়্‌তে পড়্‌তে আমরা দেখ্‌ব, আদিম প্রাণীর সৃষ্টি হ'ল একদিন, তারপর আস্তে আস্তে আরও নানা রকমের প্রাণীর সৃষ্টি হ'ল, তারও পরে সৃষ্টি হ'ল মানুষের—নর

ও নারী—কিন্তু আজকের দিনের মানুষের চেয়ে তারা ছিল একেবারে ভিন্ন। সে দিনের আদিম মানুষ কিন্তু জন্তু জানোয়ারের চেয়ে বড় ভিন্ন ছিল না। তারপর আস্তে আস্তে তাদের চিন্তা শক্তির উন্মেষ হ'ল—ক্রমেই তারা নূতনতর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে লাগল। এই চিন্তা করবার শক্তিই মানুষকে অতিকায় এবং ভয়ঙ্কর সব জন্তুর চেয়ে শক্তিমান করে তুল্‌ল। আজ তুমি দেখ্‌চ একটা ছোট মানুষ একটা মস্ত হাতীর পিঠে চ'ড়ে ওকে দিয়ে তার ইচ্ছামত সব কাজ করিয়ে নিচ্ছে। হাতীর পিঠের উপর ঐ যে ছোট্ট মাহুতটা বসে আছে ওর চেয়ে হাতীটা কিন্তু অনেক বড়, অনেক বলবান। কিন্তু মাহুত তার বুদ্ধির জোরে হয়েছে প্রভু, আর হাতীটা তার হুকুমের তাবেদার। চিন্তা শক্তির বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষও ক্রমেই হ'তে লাগ্‌ল চতুর আর বুদ্ধিমান। সে অনেক নূতন নূতন জিনিষ আবিষ্কার কর্‌ল—কেমন ক'রে আগুন জ্বাল্‌তে হয়, কেমন ক'রে মাটী চষে শস্য জন্মাতে হয়, কেমন ক'রে পরণের কাপড় বুন্‌তে হয়, কেমন ক'রে থাকবার ঘর তৈরী কর্‌তে হয়—এ-সব। তারপর কতকগুলি নর-নারী একত্র হ'য়ে বসবাস সুরু কর্‌ল, আর এমনি করেই প্রথম জনপদের পত্তন হ'ল। এরকম জনপদ তৈরী হ'বার আগে, সব মানুষ ঘুরে ঘুরে বেড়াত, থাকবার হয়তো কোন রকমের তাঁবুটাবু ছিল। তখন পর্য্যন্তও কিন্তু মানুষ মাটী চষে শস্য জন্মাতে শিখে নাই। কাজেই সে সময় চাউল ছিল না, রুটী তৈরী করবার আটা ময়দা ছিল না,

শাক সব্জি ছিল না, আর আজকের দিনে যে সব সুখাদ্য তোমরা আহার কর, তার কিছুই তারা জান্‌ত না। হয়তো কোন রকমের বুনো ফল বাদাম ছিল যা তারা খেত, কিন্তু পশুর মাংসই ছিল তাদের প্রধান খাদ্য।

এই জনপদ অথবা সহরগুলি যত সমৃদ্ধ হ'তে লাগ্‌ল, মানুষও সেই সাথে সাথে নানা রকমের শিল্প কাজ শিখ্‌তে লাগ্‌ল। লিখ্‌বার প্রণালীও তারা আবিষ্কার কর্‌ল। বহুদিন পর্য্যন্ত কিন্তু কাগজ আবিষ্কার হয় নাই। প্রথম অবস্থায় মানুষ ভোজপত্রে অথবা তালপাতে লিখ্‌ত। আগাগোড়া তাল-পাতায় লেখা পুঁথি এখনও কোন কোন লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়। তারপর এল কাগজের যুগ, লেখাটাও সেই সাথে অনেক সহজ হ'য়ে এল। কিন্তু তখন পর্য্যন্তও ছাপাখানার আবিষ্কার হয় নাই, কাজেই এখনকার মত হাজার হাজার বই একই দিনে ছেপে ফেলা সম্ভব ছিল না। একখানা বই কেবল একবারই লেখা হ'ত, তার থেকেই শেষে অন্যগুলি নকল ক'রে নিতে হত। কাজেই বুঝতে পার, অনেক অনেক বই সে দিনে ছিল না। একখানা বই কিন্‌তে বইর দোকানে ছুটে গেলেই হ'ত না। একজন কাউকে দিয়ে বইখানা নকল করিয়ে নিতে হ'ত, কাজেই সময়ও লাগ্‌ত অনেক। সেই দিনে লোকে বই লিখ্‌ত হাতে, হাতের লেখা কিন্তু তাদের খুব সুন্দর ছিল। আজও অনেক লাইব্রেরীতে খুব সুন্দর হাতে লেখা বিস্তর বই আছে। ভারতবর্ষে ত বিশেষ ক'রে সংস্কৃত, পারস্য ও উর্দ্দু ভাষায় এম্‌নি
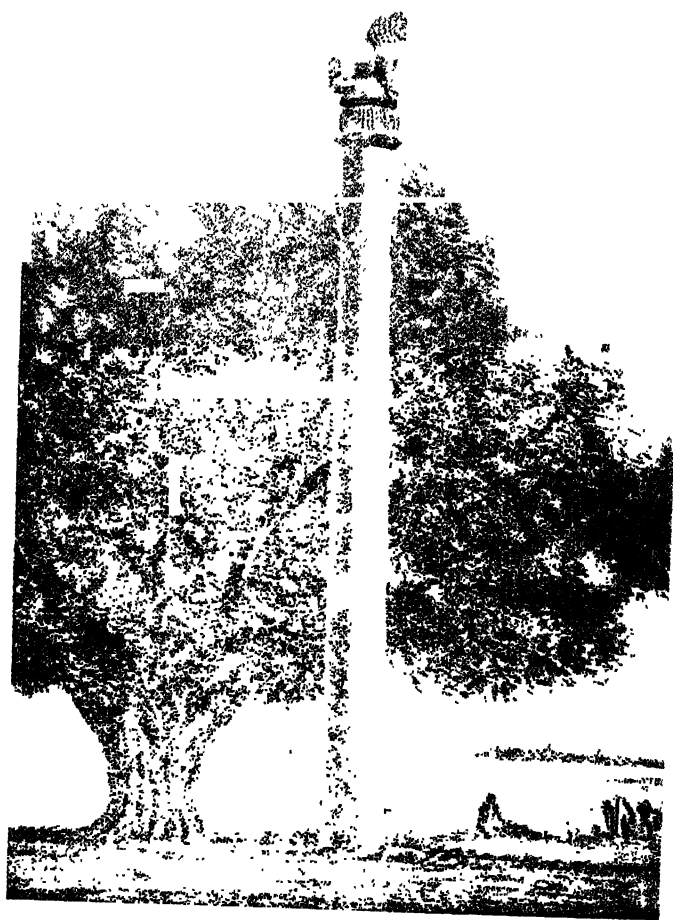
অশোক স্তম্ভ।

বহু শত বৎসর আগে মহারাজ অশোক ছিলেন এই ভারতবর্ষের একজন মহৎ আর খুব ভাল রাজা। তিনি তাঁর রাজ্যে এই রকম সব স্তম্ভ তৈরী ক'রে তার গায় সুন্দর সুন্দর উপদেশপূর্ণ বাণী খোদাই ক'রে রাখতেন।

হাতে লেখা বই অনেক আছে। অনেক সময়ই এই নকল-নবীশগণ বইয়ের পাতায় নানা রকমের সুন্দর সুন্দর ফুল আর ছবি এঁকে বইখানাকে চিত্রিত করত।

সহর সব গ'ড়ে উঠ্‌বার সাথে সাথে বিভিন্ন দেশ আর জাতিও সব গ'ড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। যে সব লোক কাছাকাছি একই দেশে বাস করত, স্বভাবতই তাদের মধ্যে ঘনিষ্টতাও ছিল বেশী। অন্য দেশের লোকের চেয়ে নিজেদের সবাই ভাব্‌ত শ্রেষ্ঠ, কাজেই বোকার মত পরস্পর লড়াই ক'রে মরত। সে দিনে মানুষ বুঝ্‌ত না, আজকের দিনেও কিন্তু মানুষ এই সহজ কথাটা বুঝ্‌তে শিখে নাই যে, মারামারি ক'রে একে অন্যের প্রাণবধ করা সব চেয়ে বোকামী, এতে কার-ই বা কি উপকার হয় বল ত?

মাঝে মাঝে নানা প্রাচীন পুঁথির খোঁজ আমরা পাই, যা থেকে আদিম যুগের নগর ও দেশের কাহিনী আমরা জান্‌তে পাই। এমন সব পুঁথি অবশ্য অনেক নেই, তা হ'লেও আরও অনেক জিনিষ আছে যা থেকেও সাহায্য পাওয়া যায়। সেই পুরাকালের রাজামহারাজাগণ তাদের রাজত্বের ঘটনাবলী প্রস্তর-ফলকে অথবা স্তম্ভ-গাত্রে লিখে রাখ্‌তেন। বইত আর বেশী দিন টিকে না, বইএর কাগজ পোকে কাটে, পঁচে যায়। পাথরের আয়ু এর চেয়ে অনেক বেশী। এলাহাবাদ ফোর্টের অশোক স্তম্ভের কথা হয়তো তোমার মনে আছে। বহু শত বৎসর আগে মহারাজ অশোক ছিলেন এই ভারতবর্ষেরই একজন মস্ত রাজা, ঐ স্তম্ভের গায় তিনি তাঁর এক অনুশাসন খোদাই ক'রে

রেখেছেন। লক্ষ্ণৌ মিউসিয়মেও তুমি অনেক খোদাই করা প্রস্তরফলক দেখেছ। মহারাজ আশোকের বহু স্তম্ভ আর অনুশাসন ভারতবর্ষের নানা স্থানে দেখ্তে পাওয়া যায়।

নানা দেশের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা ক'রে আমরা জেনেছি, বহু প্রাচীন যুগেও চীন, মিশরে নানা প্রসিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়েছিল। ইয়োরোপে কিন্তু তখনও কেবল কতকগুলি অসভ্য জাতিরই বাস ছিল। আমরা আরও জান্তে পাই ভারতের গৌরবময় যুগের কথা, যে সময় রামায়ণ, মহাভারত রচিত হয়েছিল। ভারতবর্ষ সে দিন ছিল সম্পদশীল, শক্তিমান দেশ। আজ কিন্তু আমাদের দেশ বড় দরিদ্র, পরাধীন। নিজের দেশেও আমরা পরাধীন, ইচ্ছামত কোন কিছুই করবার সাধ্য নাই আমাদের। কিন্তু চিরকালই আমাদের এই অবস্থা ছিল না, মনে প্রাণে চেষ্টা কর্‌লে হয়ত দেশকে আবার স্বাধীন করা যায়, দরিদ্রের ভাগ্যের উন্নতি করা যায় এবং ইউরোপের দেশগুলির মতই আমাদের দেশকেও সুখময় ক'রে তোলা যায়।

আমার পরের চিঠিতে পৃথিবীর আদিম কাহিনী থেকে বল্‌তে সুরু করব।

অশোকের অনুশাসন।

মহারাজ অশোক তাঁর রাজ্যের নানা স্থানে, পর্ব্বতগাত্রে ও প্রস্তর স্তম্ভে সুন্দর সুন্দর উপদেশপূর্ণ বাণী ও ধর্ম্মের কথা ক্ষোদিত ক'রে রেখেছিলেন।

পৃথিবীর জন্ম-কথা।

পৃথিবী যে সূর্য্যের চারদিকে ঘোরে, আর চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, এ কথা তো তুমি জানই। পৃথিবীর মতই, আরো কতকগুলি পদার্থও যে সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে, একথাও হয়ত তোমার জানা আছে। আমাদের পৃথিবী আর ঐ সকল পদার্থকে সূর্য্যের গ্রহ বলা হয়। চন্দ্রকে বলা হয় পৃথিবীর উপগ্রহ। কারণ, মনে হয় এ যেন পৃথিবীর কাঁধে ঝুলে আছে। অন্যান্য গ্রহেরও উপগ্রহ আছে। এই সূর্য্য, আর গ্রহ-উপগ্রহ-গুলি মিলে বেশ একটি সুখের পরিবার গ'ড়ে তুলেছে। এ পরিবারটিকে বলা হয় সৌরজগৎ। "সূর্য্য" শব্দ থেকে "সৌর" শব্দটি এসেছে। সূর্য্যি-ঠাকুর হ'লেন এ পরিবারের বাবা, এই জন্যই এদের একসঙ্গে বলা হয় সৌরজগৎ।

রাত্তিরে আকাশে যে অসংখ্য তারকা দেখতে পাও, তার মধ্যে কিন্তু মাত্র কয়েকটি গ্রহ, তাদের অবশ্য তারকা বলা উচিত নয়। আচ্ছা, কেমন ক'রে কোন্‌টা তারকা, কোন্‌টা গ্রহ বুঝা যায়—বল্‌তে পার? এই তারকাগুলির তুলনায়, গ্রহগুলিও কিন্তু আমাদের পৃথিবীর মতই ভারী ছোট্ট, কিন্তু আমাদের বেশী কাছে আছে বলে ওদের একটু বড় দেখায়। যেমন ধর চাঁদ, ওকে ত

বলা যায় সৌর পরিবারের ছোট্ট একটা খোকা, কিন্তু তুলনায় আমাদের বেশী কাছে আছে বলে, ওকেই সব চেয়ে বড় দেখায়। তারকা আর গ্রহ এদের চিন্‌বার আসল উপায় হয়েছে কিন্তু কোন্‌টা মিট্‌মিট্‌ করে তাই দেখা। তারকাগুলিই মিট্‌মিট্‌ করে, গ্রহগুলি কিন্তু করে না। সূর্য্যের কিরণ পায় বলেই গ্রহগুলিকে উজ্জ্বল দেখায়। চাঁদ আর গ্রহগুলির গায় যে সূর্য্যকিরণ পড়ে, সেই প্রতিফলিত কিরণটাই আমরা দেখ্‌তে পাই। তারকাগুলি কিন্তু আসলে নিজেরাই এক একটী সূর্য্য। ওদের গায় গন্‌গনে আগুন জ্বল্‌চে আর ভারি গরম—তাই ওরা নিজেরাই কিরণ দেয়। সত্যি বল্‌তে আমাদের সূর্য্যও কিন্তু একটি তারকা, কেবল কাছে আছে বলেই যা বড় দেখায়, মনে হয় যেন একটা মস্ত আগুনের গোলা।

তবেই দেখ আমাদের পৃথিবী হ'লেন সূর্য্য-ঠাকুরের পরিবারের অর্থাৎ সৌর জগতের একজন। পৃথিবীকে তো আমরা মনে করি মস্ত বড়। অবশ্য আমাদের মত ক্ষুদ্র মানুষ-গুলির তুলনায় খুব বড়ই, খুব দ্রুতগামী ট্রেন অথবা ষ্টিমারে চ'ড়ে গেলেও পৃথিবীর এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেতে অনেক সপ্তাহ, অনেক মাস লেগে যায়। কিন্তু আমাদের কাছে একে এত বড় মনে হলেও, আসলে এ আকাশের গায় একটা ছোট্ট ধূলি-কণার মতই ভেসে আছে। সূর্য্যই আমাদের কাছ থেকে কয়েক কোটি মাইল দূরে, আর আর তারকাগুলি তো আরো আরো অনেক দূরে।

জ্যোতির্ব্বিদেরা, যাঁরা এই তারকাদের বিষয় নিয়ে অনেক পড়াশুনা আর আলোচনা করেন, তাঁরা বলেন বহু বহু যুগ আগে এই পৃথিবী আর গ্রহগুলিও ছিল সূর্য্যের অংশ। আজকের মত সে দিনেও সূর্য্য ছিল একটা জ্বলন্ত বস্তু—ভীষণ গরম। যেমন করেই হউক সূর্য্যের গা থেকে ছোট ছোট টুক্‌রা সব আল্‌গা হ'য়ে আকাশের ভিতর ছুটে গেল। কিন্তু তাদের বাবা সূর্য্যি-ঠাকুরের শাসন থেকে একদম বেরিয়ে আস্‌তে পার্‌ল না। কেমন হ'ল জান, যেন একটা দড়ি দিয়ে ও'দের বেঁধে রাখা হ'ল, আর ওরাও অনবরত সূর্য্যের চারদিকে ঘুর্‌তে লাগ্‌ল। এই যে একটা অদ্ভুত শক্তি, যাকে আমি দড়ির সাথে তুলনা করেছি, সেটা সব সময়ই ছোট জিনিষকে বড়র দিকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ শক্তির বলেই সব জিনিষ নীচের দিকে পড়ে। আমাদের কাছাকাছি পৃথিবীই হ'ল সব চেয়ে বড় বস্তু, কাজেই পৃথিবী সব জিনিষকেই নিজের দিকে টেনে নেয়।

এমনি ক'রে আমাদের পৃথিবীও যখন সূর্য্যের শরীর থেকে ছুটে বেড়িয়ে এসেছিল, সে দিন এই পৃথিবীও ছিল ভয়ানক গরম, আর তার চারিদিকে ছিল ভীষণ গরম গ্যাস আর বাতাস। কিন্তু সূর্য্যের চেয়েত ও অনেক ছোট, কাজেই শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর ঠাণ্ডা হ'তে আরম্ভ করল। সূর্য্যও কিন্তু আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হচ্ছে, কিন্তু একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়ে যেতে এর আরো বহু লক্ষ বছর লেগে যাবে। পৃথিবী কিন্তু তার চেয়ে অনেক কম সময়েই ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। যখন প্রথম অবস্থায় পৃথিবী

ছিল খুব গরম, তখন এর বুকে মানুষ, জন্তু, গাছ, পালা কারুর-ই বাঁচ্‌বার যো ছিল না—সব তো পুড়েই ছাই হ'য়ে যেত।

যেমন সূর্য্যের এক টুক্‌রা খ'সে হ'ল পৃথিবী, তেমনি আবার পৃথিবীরও একটুক্‌রা খ'সে হ'ল চন্দ্র। কেহ কেহ মনে করেন, আমেরিকা আর জাপানের মধ্যে যে প্রশান্ত মহাসাগরের গর্ত্তটা, পৃথিবী থেকে ঐ অংশটাই খ'সে গিয়ে হয়েছে চন্দ্র।

তারপর পৃথিবী আরম্ভ কর্‌ল ঠাণ্ডা হ'তে—ঠাণ্ডা হ'তে কিন্তু বহু সময় কে'টে গেল। আস্তে আস্তে পৃথিবীর উপরটা ঠাণ্ডা হ'ল কিন্তু ভিতরটা র'য়ে গেল খুব গরম। এখনও যদি তুমি কয়লার খনির নীচে যাও, দেখ্‌বে যত নীচে যাবে ততই গরম বোধ কর্‌বে। হয়তো পৃথিবীর অনেক নীচে যেতে পার্‌লে দেখা যাবে এখনও সেখানে আগুন জ্বল্‌ছে। চাঁদও ঠাণ্ডা হ'তে আরম্ভ কর্‌ল কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে তো ও অনেক ছোট, কাজেই পৃথিবীর আগেই ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। চাঁদকে দেখে তো মনে হয় ভারী ঠাণ্ডা—না? চাঁদকে বলা হয় 'হিমাংশু'। হয়ত এর সমস্তটাই এখন হিমগিরি আর তুষার-ভূমি।

যখন পৃথিবী ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল, সমস্ত বাষ্প জমে হ'য়ে গেল জল, আর বৃষ্টি হ'য়ে ঝরে পড়্‌ল পৃথিবীর বুকে। সে সময় বৃষ্টির ঘটা হ'য়েছিল নিশ্চয়ই খুব। পৃথিবীর গায় যত ছিল গর্ত্ত, সব গেল ভ'রে; আর তার থেকেই হ'ল সব সাগর, আর মহাসাগর।

যখন পৃথিবীর উপরটা আর সমুদ্রের জল বেশ ঠাণ্ডা হ'য়ে

গেল, তখনই পৃথিবীর বুকে সমুদ্রের জলে, জীব জন্তুর বেঁচে থাকা সম্ভব হ'ল। পরের চিঠিতে প্রাণী সৃষ্টির কথা বলব।

প্রাণের সূচনা।

আগের চিঠিতে তোমাকে বলেছি পৃথিবী অনেক কাল ধ'রে এত গরম ছিল যে কোন প্রাণীরই সে সময় বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। এখন প্রশ্ন কর্‌তে পার পৃথিবীতে প্রাণের সূচনা হ'ল কবে থেকে, আর সৃষ্টির আদিম প্রাণীই বা ছিল কি রকম? প্রশ্নটা যেমন সুন্দর, উত্তরটা কিন্তু আবার তেমনি কঠিন। আচ্ছা প্রথমে দেখা যাক্ প্রাণ বল্‌তে কি বুঝায়। তুমি হয়ত বল্‌বে, বাঃ রে! এই যে মানুষ আর জন্তু জানোয়ার দেখ্‌ছি, এরাই তো সব জ্যান্ত প্রাণী। তবে গাছ, পালা, শাক, সব্জি, পাতা, ফুল এরা কি? এদেরও কিন্তু প্রাণ আছে, এরাও প্রাণী। এরা জল আর বাতাস খেয়ে বেঁচে থাকে; তারপর এরাও একদিন মরে যায়। গাছ আর জন্তুর মধ্যে মাত্র এইটুকু তফাৎ, যে গাছ ঘুরে বেড়ায় না। লণ্ডনের কিউগার্ডেনে (Kew garden) তোমাকে যে কয়েকটা ছোট ছোট চাড়া গাছ দেখিয়েছিলাম, হয়ত তোমার এখনও মনে আছে। ঐ অর্কিড, পিচারের ছোট্ট গাছগুলি কিন্তু সত্যি সত্যি পোকা ধরে খায়। আবার দেখ সমুদ্রের নীচে স্পঞ্জ রয়েছে ওরাও এক রকমের প্রাণী, কিন্তু ঘুরে বেড়ায়

না। আবার এমনও কোন কোন পদার্থ আছে, যাদের প্রাণী বল্‌ব, কি গাছ বল্‌ব, বুঝাই মুস্কিল। যখন তুমি উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান আর প্রাণী বিজ্ঞান পড়্‌বে, তখন এমন অনেক পদার্থের কথা শিখ্‌বে, যাদের ঠিক ঠিক না বলা যায় প্রাণী, না বলা যায় উদ্ভিদ্। কেউ কেউ তো বলেন পাথরেরও প্রাণ আছে, ওদেরও এক রকমের ব্যথা বোধ আছে—চোখে অবশ্য দেখা যায় না। জেনেভায় যখন আমরা ছিলাম সেখানে এক ভদ্র লোক যে আমাদের সাথে দেখা কর্‌তে এসেছিলেন, তোমার হয়তো মনে আছে—উনিই আমাদের স্যার জগদীশ বসু। তিনি তো পরীক্ষা ক'রেই দেখিয়েছেন যে উদ্ভিদের প্রাণ আছে; আর পাথরেরও যে এক রকমের প্রাণ আছে, ইহাও তিনি বিশ্বাস করেন।

কাজেই দেখ কাদের প্রাণ আছে, আর কাদের যে নেই তা ঠিক ক'রে বলা মুস্কিল। যাক্, পাথরের কথা না হয় ছেড়েই দিই, গাছ আর প্রাণীর কথাই ধরা যাক্। চোখের সাম্‌নে তো আমরা নানা রকমের অসংখ্য প্রাণী দেখ্‌ছি। প্রথম ধর মানুষ—তাদের কেউ বুদ্ধিমান, কেউ বোকা। তারপর ধর জন্তু জানোয়ার—এদের মধ্যেও কতকগুলি আছে বেশ বুদ্ধিমান, আবার কতকগুলি আছে ভারি বোকা। হাতী, বানর, পিঁপ্‌ড়া এরা তো বেশ বুদ্ধিমান, আবার মাছ এবং ঐ জাতীয় আরো কতকগুলি সামুদ্রিক প্রাণী আছে, তারা কিন্তু একেবারে নিম্নস্তরের জীব। আর তারও নীচের ধাপে রয়েছে

স্পঞ্জ ও জেলি মাছ, আর একেবারে শেষের দিকে কতকগুলি আছে, যাদের বলা যায় অর্দ্ধেক প্রাণী, অর্দ্ধেক উদ্ভিদ্।

এখন দেখ্‌তে হ'বে এই সব নানা রকমের জীব কি একই সময়ে হঠাৎ জন্ম নিয়েছে, না আস্তে আস্তে একটির পর একটির জন্ম হয়েছে। কেমন ক'রে এর জবাব পাই বল তো? সেই আদিম যুগের লেখা কোন বই তো আর আমাদের কাছে নেই। তবে? তোমাকে যে বলেছিলাম প্রকৃতি দেবীর নিজের হাতের লেখা একখানা বই আছে; তোমার কি মনে হয়, সেই বইখানা আমাদের কিছু সাহায্য কর্‌তে পারে? সত্যি, ঐ বইখানার ভিতরই কিন্তু আমাদের জবাব মিল্‌বে। পুরাণো প্রস্তরের ভিতর নানা রকমের জীব জন্তুর হাড় পাওয়া যায়, যাদের বলা হয় ফসিল (fossil)। এই সব প্রস্তরের গঠন হয়েছে বহু বহু যুগ আগে, কাজেই বলা যায় যে সব প্রাণীর ফসিল এই সব প্রস্তরের ভিতর পাওয়া যায়, সেই আদিম যুগে, যখন ঐ প্রস্তরের গঠন হয়েছে, নিশ্চয়ই সেই সব প্রাণীও বেঁচে ছিল। লণ্ডনের South Kengsington Museum এ তো তুমি ছোট বড় নানা রকমের fossil দেখেছ।

যখন কোন প্রাণী মরে যায়, তার নরম মাংসটা শীঘ্রই পঁচে নষ্ট হ'য়ে যায়; হাড়গুলি কিন্তু বহু দিনেও নষ্ট হয় না। আর এই কঙ্কালগুলিই এখন আমাদিগকে সেই আদিম যুগের প্রাণীর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু হাড় নাই এমন প্রাণীও তো আছে, যেমন ধর জেলি ফিস। এ যখন মরে যায়,

এর অস্তিত্বের কোন প্রমাণই তো এ রেখে যায় না।

পৃথিবীটা ঠাণ্ডা হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর এক একটা মৃত্তিকাস্তর গঠিত হয়েছে। সেই সব বিভিন্ন মৃত্তিকা-স্তর সংগ্রহ ক'রে যদি ভাল ক'রে পরীক্ষা করা যায়, তবে বেশ সহজেই বুঝা যাবে, বিভিন্ন রকমের প্রাণী বিভিন্ন যুগে বেঁচে ছিল—শূন্য থেকে সবাই মিলে এক দিনে জন্ম নেয় নি। সব প্রথমে খোসাওয়ালা খুব সাদাসিধা গঠনের এক রকমের প্রাণী ছিল, যেমন শামুক। সমুদ্রের তীরে যে তুমি সুন্দর সুন্দর নানা রকমের ঝিনুক কুড়িয়েছ, ওরা কিন্তু সব ঐ মৃত প্রাণীদের বাইরের শক্ত খোসা। এর পরের যুগের প্রাণীদের গঠন আরেকটু গোলমেলে—যেমন সাপ, অতিকায় হস্তী, আর বর্ত্তমান যুগের নানা রকমের পশু পাখী। সর্ব্বশেষ যুগে আমরা পাই মনুষ্যের কঙ্কাল। কাজেই মনে হয়, এই জীব-সৃষ্টির একটা ক্রম-বিকাশের রীতি আছে। সব-প্রথমের সৃষ্টি অতি সাদাসিধা ধরণের প্রাণী, তার পর ক্রমেই জটিল গঠনের আরো উচ্চতর প্রাণীর সৃষ্টি হ'ল। ক্রমে যে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে, তা-ই বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব। কেমন ক'রে যে অতি সাধারণ গঠনের স্পঞ্জ, শামুক আস্তে আস্তে পরিণতি লাভ ক'রে এত উন্নত হ'ল, সে এক চমৎকার গল্প। তা তোমাকে আরেক দিন বল্‌ব। আজ কেবল সৃষ্টির আদিম প্রাণীর কথাই বল্‌ব।

পৃথিবী যখন আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল, সে দিনকার

প্রথম জীব হয় তো ছিল জেলির মত নরম থল্‌-থলে এক রকমের সামুদ্রিক পদার্থ, তাদের না ছিল খোসা না ছিল হাড়। এই কঙ্কালহীন দেহের তো ফসিল থাক্‌তেই পারে না, কাজেই এদের বিষয় আমাদের কতকটা আন্দাজ ক'রেই নিতে হয়। এ রকম জেলির মত সামুদ্রিক প্রাণী কিন্তু আজকালও পাওয়া যায়। এদের আকৃতি গোল, কিন্তু খোসা অথবা হাড় নেই, কাজেই আকৃতিটাও অনবরতই বদলে যাচ্ছে। কতকটা এ রকম—
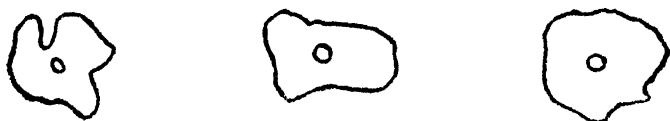
মধ্যখানে যে একটা ফুট্‌কী র'য়েছে তা লক্ষ্য করো। এটাকে ইংরজীতে বলে নিউক্লিয়াস (Neucleus), কতকটা হৃদ্‌পিণ্ডের মত। এদের প্রাণীই বল আর যাই বল, দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাওয়া এদের প্রকৃতির একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব। হয় কি জান, এক জায়গায় সরু হ'তে হ'তে এরা ছিন্ন হ'য়ে যায়, প্রত্যেক ভাগই কিন্তু প্রথমটার মতই থল্‌-থলে। নীচে দেখ কেমন ক'রে এরা দু'ভাগ হ'য়ে যাচ্ছে—

একটা জিনিষ লক্ষ্য করো—হৃদ্‌পিণ্ডটাও দু'ভাগ হ'য়ে এক এক অংশ এক এক ভাগে যুক্ত হয়েছে। এম্‌নি ক'রে এই প্রাণীগুলি বিভক্ত হ'য়ে হ'য়ে বেড়েই যাচ্ছে।

আমাদের পৃথিবীতে এই রকম প্রাণীরই প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল। জীবনের কি সহজ সাদাসিধা প্রতীক! পৃথিবীতে সেই দিন এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এর চেয়ে পরিণত আর কোন প্রাণীই ছিল না। ঠিক ঠিক জীব-সৃষ্টি তখন পর্য্যন্তও কিন্তু হয় নাই, আর মানুষের জন্ম হ'তে তো তখনও বাকী ছিল আরো বহু লক্ষ বছর।

এই জেলির পরের ধাপে এল সামুদ্রিক ঘাস, শামুক, কাকড়া, পোকা। তার পরের ধাপে এল মাছ। এদের বিষয় কিন্তু আমরা অনেক কিছু জানি, কারণ মরণের পর এরা রেখে গেছে এদের কঙ্কাল আর শক্ত খোসা। আজ বহু যুগ পরে সে সব কঙ্কালের খোঁজ পেয়েছি ব'লেই, তাদের বিষয় আমরা আলোচনা কর্‌ছি। সমুদ্রের নীচে কাঁদার ভিতর তাদের কঙ্কাল আর খোসাগুলি প'ড়ে ছিল। নূতন নূতন কাঁদা আর বালু-স্তরের নীচে ওরা যত্নে ঢাকা প'ড়ে রইল। নীচের কাঁদাটা উপরের বালু আর কাঁদার চাপে শক্ত হ'য়ে গেল। শক্ত হ'তে হ'তে শেষে পাথর হ'য়ে গেল। এ রকম ক'রেই সমুদ্রের নীচে পাষাণ-মৃত্তিকা গ'ড়ে উঠ্‌ল।

হয়তো এক দিন ভূমিকম্পে অথবা অন্য কোন কারণে সমুদ্রের নীচের পাষাণ-স্তর মুক্তি পে'য়ে বেরিয়ে এল, আর সেই সাথে দেখা দিল শুক্‌নো মাটী। তারপর সেই শক্ত পাষাণ-স্তর নদী আর বৃষ্টির জলে ধুইয়ে ধুইয়ে ক্ষয় হ'য়ে গেল। আর সেই কঙ্কালটা, যা নাকি বহু যুগ ধ'রে পাষাণের ভিতর

লুকিয়ে ছিল, সেটাও এক দিন বেড়িয়ে এল। সেই ফসিলটাকে কেউ এক দিন আবিষ্কার কর্‌ল, আর সেটাকে পরীক্ষা ক'রে মানুষ জন্মাবারও বহু যুগ আগে পৃথিবীটা কেমন ছিল তারই ইতিহাসটা ঠাওর ক'রে নিল। এই সহজ প্রণালীর প্রাণীগুলিই যে কেমন ক'রে আজকের দিনের পরিণত অবস্থা লাভ করেছে, তারই গল্প এর পরের চিঠিতে লিখ্‌ব।

মাছের ফসিল্।

শক্ত পাথরের গায় একটা মাছের ছাপ দেখে নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হচ্ছ। কে জানে কোন্ অতীতকালে, কত লক্ষ বছর আগে, এই মাছটা সমুদ্রের নীচে ম'রে প'ড়ে ছিল, এর নরম অংশটা নষ্ট হ'য়ে গেল, কিন্তু শক্ত অংশটা কাদার নীচে ঢাকা প'ড়ে রইল। সমুদ্রের নীচের কাদা, নূতন নূতন কাদা আর মাটীর চাপে শক্ত হ'তে হ'তে পাথর হ'য়ে গেল, আর সেই যে মরা মাছটা সেটা হ'য়ে গেল ফসিল্। সমুদ্রের তলদেশে বহু লক্ষ বছর ধ'রে সঞ্চিত কাদা মাটীর দ্বারা ডাঙ্গার সৃষ্টি হ'ল, আর মাটীর নীচে লুকানো ফসিলটাও কোনো রকমে একদিন আমাদের চোখের সাম্নে

পাঁচের চিঠি

প্রাণীর আবির্ভাব।

বলেছি তো তোমাকে, পৃথিবীর প্রথম প্রাণী ছিল হয়তো ছোট ছোট সরল গঠনের সামুদ্রিক জীব, আর জলীয় ঘাস। এদের কেবল জলের মধ্যেই বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল, যদি কখনও ডাঙ্গায় উঠে আস্‌ত, তবে শুকিয়ে মরে যেত। দেখেছ তো জেলি মাছ সমুদ্রের পাড়ে এসে আট্‌কে গেলে কেমন ক'রে শুকিয়ে যায়। সে দিনে জল আর জলাভূমি ছিল বিস্তর, আজকালকার দিনের চেয়ে তো নিশ্চয়ই খুব বেশী। এ সব জেলি মাছ আর সামুদ্রিক জীবগুলির মধ্যে যাদের আবরণটা ছিল একটু শক্ত, তাদেরই শুক্‌নো মাটীতে বেশী সময় বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল, কারণ সেগুলি খুব সহজেই শুকিয়ে যেত না। এম্‌নি ক'রেই পাত্‌লা আবরণের প্রাণীগুলির সংখ্যা ক্রমেই কম্‌তে লাগ্‌ল। আর যাদের আবরণটা ছিল একটু শক্ত তাদের সংখ্যা বাড়্‌তে লাগ্‌ল। এ ব্যাপারটা কিন্তু বেশ লক্ষ্য কর্‌বার জিনিষ। আসল কথা হচ্ছে, সব প্রাণীই প্রকৃতির সাথে আপোষ ক'রে বেঁচে থাক্‌তে চায়।

লণ্ডনের South Kensington Museum এ দেখেছ, যে সব শীতের দেশে খুব বরফ পড়ে, সে সব দেশের পশু পাখীর

গায়ের রং, বরফের মত ধব্‌ধবে সাদা। আবার যে সব গরম দেশে যথেষ্ট সবুজ ঘাস আর গাছ আছে, সেখানকার পশু পাখীর গায়ের রং সবুজ, অথবা খুব উজ্জ্বল আর কোন রং। এ রং পরিবর্ত্তনের কারণ আর কিছুই নয়, পশু পাখী সব প্রাণীই চায়, নিজেদের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা কর্‌তে। তাই চারদিকের সাথে নিজেদেরও সদৃশ ক'রে নেয়; কারণ চারিদিকের সাথে গায়ের রং মিলে গেলে আর কোন শত্রু তাদের দেখ্‌তে পাবে না। শীতের দেশের প্রাণীদের গায়ে যে লোম হয়, তারও এই কারণ—শীতের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করা। আবার দেখ, বাঘের জন্ম রোদের দেশে, তার গায়ে থাকে হল্‌দে ডোরা ডোরা দাগ। মনে হয় যেন, বন-জঙ্গলের ভিতর গাছের ফাঁকে ফাঁকে রোদের আলো। এর কারণও কিন্তু শত্রুর হাত থেকে নিজকে রক্ষা করা। গায়ে হলদে ডোরা দাগ থাকার দরুণ গভীর জঙ্গলের ভিতর বাঘকে দেখ্‌তে পাওয়া মুস্কিল। এই যে, সমস্ত প্রাণীর পারিপার্শ্বিকের সাথে বর্ণ-সাম্য, আর প্রাকৃতিক আবহাওয়া অনুযায়ী দেহের সংস্কার, এটা কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে একটা মস্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। অবশ্য প্রাণীগুলি যে নিজেরাই চেষ্টা ক'রে এই পরিবর্ত্তন এনেছে অথবা আন্‌তে পারে, তা নয়। আসল কথা, যাদের এই পরিবর্ত্তন হয়, আর পারিপার্শ্বিকের সাথে আপোষ ক'রে নিতে পারে, তারাই বাঁচ্‌বার সুযোগ পায় বেশী। কাজেই তাদের সংখ্যাও বেড়ে যায়, অন্যগুলির বাড়ে না। এই প্রাকৃতিক

নিয়মটা মনে রাখ্‌লে, অনেক ঘটনাই আমাদের বুঝা সহজ হ'বে। জীব-জগতের নিম্নতর প্রাণী যে কেমন ক'রে উচ্চতর প্রাণীতে পরিণত হ'ল, আর কেমন ক'রেই বা লক্ষ লক্ষ বছরের পরিবর্ত্তনের ফলে মানুষের সৃষ্টি হ'ল তা-ও বুঝ্‌তে পারব। এই পরিবর্ত্তনটা কিন্তু আমাদের চোখে ধরা পড়ে না, কারণ পরিবর্ত্তনটা হয় যেমন অতি ধীরে, আমাদের বেঁচে থাকবার মিয়াদও আবার তেম্‌নি বড় কম। কিন্তু প্রকৃতি তার এই পরিবর্ত্তন আর সংস্কারের কাজ করেই যাচ্ছেন—এক মুহূর্ত্তের তরেও তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই।

মনে রেখ, পৃথিবী আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা আর শুক্‌নো হ'য়ে আস্‌ছিল। পৃথিবী যেমন ঠাণ্ডা হ'তে লাগ্‌ল, এর আবহাওয়ার-ও তেম্‌নি পরিবর্ত্তন হ'তে লাগ্‌ল, আর সাথে সাথে অন্য সব জিনিষের-ও। পৃথিবীর পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে প্রাণী জগতেও পরিবর্ত্তন আরম্ভ হ'ল, আর নূতন নূতন প্রাণীরও উদ্ভব হ'তে লাগ্‌ল। সৃষ্টির প্রথম যুগে যে সব অতি সাধারণ সামুদ্রিক প্রাণী ছিল, তারাই ক্রমোন্নতির ফলে উচ্চতর পরিণতি লাভ করেছে। শুক্‌নো ডাঙ্গা ক্রমে যতই বেশী হ'তে লাগ্‌ল, কুমীর আর ব্যাঙের মত সব প্রাণীরও সৃষ্টি হ'তে লাগ্‌ল—যারা ডাঙ্গায়ও থাক্‌ত, জলেও থাক্‌ত। তারপর সৃষ্টি হ'ল স্থলচর প্রাণীর, আর তারও পরে আকাশচারী বিহঙ্গের।

আমি ব্যাঙের কথা বল্‌লাম এই কারণে যে, এর জীবন থেকে একটা মজার জিনিষ শিখ্‌বার আছে। কেমন ক'রে যে

জলচর প্রাণী স্থলচর হ'ল, এক ব্যাঙের জীবন থেকেই তা বুঝা যাবে। প্রথম ব্যাঙাচি অবস্থায় একে বলা যায় জলচর মাছ, পরের অবস্থায় এ হয় স্থলচর প্রাণী। অন্যান্য স্থলচর প্রাণীর মতই এ-ও তখন ফুস্‌ফুসের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়।

সেই আদিম যুগে স্থলচর প্রাণীর যখন প্রথম আবির্ভাব হ'ল, তখন পৃথিবী জুড়ে ছিল বড় বড় বন আর জঙ্গল। মাটী ছিল তখন জলা আর তার উপর ছিল ঘন বন। এই বনগুলি আস্তে আস্তে মাটীর নীচে ঢাকা পড়ে গেছে, আর পাথর আর মাটীর চাপে হয়ে গেছে কয়লা। জানই তো মাটীর অনেক নীচে খনির ভিতর কয়লা পাওয়া যায়। এই কয়লার খনি কিন্তু সেই আদিম যুগের বন-জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্থলচর প্রাণীদের মধ্যে যাদের প্রথম আবির্ভাব হ'ল সেগুলি ছিল অতিকায় সাপ, গিরগিটি, আর কুমীর। এদের কোন কোনটা ছিল ১০০ ফিট লম্বা। একশো ফিট লম্বা একেকটা সাপ গিরগিটির কথা ভাব্‌তে কেমন লাগে? তোমার হয়তো মনে আছে London Museum এ ঐ সব অতিকায় প্রাণীদের কঙ্কাল দেখেছ।

তার পরের যুগের জন্তুগুলি দেখ্‌তে ছিল অনেকটা আমাদের বর্ত্তমান যুগের জন্তুগুলির মতই। এদের বলা হয় স্তন্যপায়ী, কারণ এরা এদের সন্তানদের স্তন্য পান করায়। এরা-ও প্রথম অবস্থায় কিন্তু এখনকার চেয়ে অনেক বড় ছিল। স্তন্যপায়ী জন্তুদের মধ্যে বানর আর মানুষে সবচেয়ে সাদৃশ্য
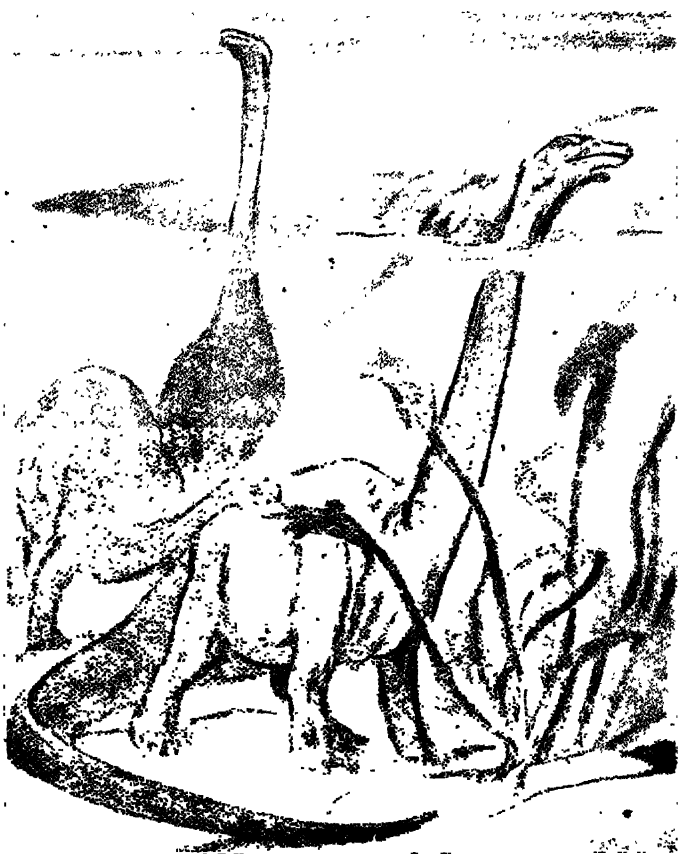
কিটিয়োসোরাস্।

৪০ হাত লম্বা একটা জানোয়ারের কথা ভাব্‌তে কেমন লাগে? এই জানোয়ারটা কিন্তু এত বড়ই ছিল।

বেশী। মানুষ কিন্তু বানরের বংশধর বলেই অনেকের বিশ্বাস। এর অর্থ বুঝলে তো? প্রত্যেক প্রাণীই প্রকৃতির সাথে আপোষ ক'রে ক'রে যেমন উন্নত হয়েছে, বানরও তেম্‌নি উন্নত হ'তে হ'তে এক দিন মানুষ হয়েছে। প্রকৃতির এই সংস্কারের কাজ কিন্তু নিত্যই চল্‌ছে। মানুষ তো আজ মনে করে তার এই উন্নতির আর শেষ নেই। মানুষ পশুর চেয়ে নিজকে কত ভিন্ন মনে করে, কিন্তু মনে রাখা ভাল বানর, বন-মানুষ আর আমরা এক বংশেরই জ্ঞাতি ভাই। আর তোমার কানে কানে আরেকটা কথা বল্‌ব, অনেক মানুষের ব্যবহারটা কিন্তু আজকের দিনেও ঠিক বানরের মতই র'য়ে গেছে।

উষা-মানব।

তোমাকে আগের চিঠিতে লিখেছি, পৃথিবীতে প্রথমে যে প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল, তা ছিল অতি সাদাসিধা গঠনের, আর সেটা-ই বহু লক্ষ যুগের পরিবর্ত্তনের ফলে আজকের আকৃতি লাভ করেছে। প্রাণীর এই ক্রম-বিবর্ত্তনের একটা প্রধান নিয়ম আমরা লক্ষ্য করেছি—সব প্রাণীই প্রকৃতির সাথে আপোষ কর্‌বার চেষ্টায় আছে। এই চেষ্টায় ফলেই তারা নূতন নূতন গুণের অধিকারী হয়েছে, উন্নততর হয়েছে, আর আকৃতিও হয়েছে ক্রমেই জটিল। এই পরিবর্ত্তন অথবা উন্নতির ধারাটা কিন্তু আরো অনেক রকমেই বুঝা যায়। যেমন ধর, সব প্রথমে যখন কঙ্কালহীন প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল, বেশী দিন ওদের বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না, কাজেই আস্তে আস্তে ওদের দেহের সাথে একটা হাড় যুড়ে গেল—মেরুদণ্ড কাজেই আমরা পেলাম, প্রাণীর দুইটা শ্রেণী—স-কঙ্কাল আর অ-কঙ্কাল। মানুষ আর তোমার চারিদিকে যে সব জন্তু দেখ্‌ছ তারা সবই স-কঙ্কাল।

এখন তোমাকে অণ্ডজ-প্রাণী থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণী পর্য্যন্ত ক্রমোন্নতির ধারাটা বুঝাতে চেষ্টা কর্‌ব। প্রথম ধর মাছ এবং

আরো কতকগুলি সহজ গঠনের প্রাণীর কথা, যারা ডিম পারে। এই নিম্ন স্তরের প্রাণীগুলি এক এক বারে অনেকগুলি ক'রে ডিম পারে, কিন্তু ডিম পেরে ডিমগুলির যত্ন নেয় না। ভারী আশ্চর্য্য, মার তার সন্তানের উপর মায়া নেই! মৎস্য-মাতা ডিম পেরে আর ওদের দিকে ফিরেও তাকায় না। দেখ্‌বার কেউ নেই, কাজেই বেশীর ভাগ ডিম-ই নষ্ট হ'য়ে যায়; আর বাকীগুলি মাছ হ'য়ে ফুটে বের হয়। প্রকৃতির রাজ্যে এ একটা মস্ত অপচয়। এর পরে প্রাণী-শ্রেণীর যতই উপরে উঠ্‌বে, ততই দেখ্‌বে তারা কম ডিম পারে, আর কম সন্তান প্রসব করে, কিন্তু মা ওদের বেশ যত্ন নেয়। যেমন ধর মুর্গী, ও ডিম পারে, ডিমে তা দেয়, তারপর বাচ্চাটা বেরিয়ে এলে কিছু দিন ওকে যত্ন ক'রে খাওয়ায়; অবশ্য বাচ্চাটা বড় হ'য়ে গেলে পর আর বিশেষ একটা যত্ন নেয় না।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর কথা এর আগের চিঠিতে তোমাকে একটু লিখেছি। এরা অণ্ডজ প্রাণীদের চেয়ে উন্নত, আর এদের মধ্যে একটা মস্ত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করবে,—এ-সব প্রাণী ডিম্ব প্রসব করে না। মা ডিমটা পেটের মধ্যে রেখে দেয়, তারপর পূর্ণ পরিণত একটি বাচ্চা-ই প্রসব করে, যেমন, কুকুর, বিড়াল, খরগোস। বাচ্চাগুলিকে এদের মা বুকের দুধ খাওয়ায়, যত্নও নেয় বেশ। এই শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যেও কিন্তু অপচয়টা বেশ দেখা যায়। খরগোসের কথাতো জান, ওরা কয়েক মাস অন্তর অন্তর অনেকগুলি ক'রে বাচ্চা দেয়, কিন্তু তার মধ্যে

আবার কতকগুলি যায় ম'রে। হাতী এদের চেয়ে আবার আরেকটু উঁচু স্তরের জন্তু। এ কিন্তু একবারে মাত্র একটা বাচ্চাই প্রসব করে, কিন্তু বাচ্চাটার যত্ন নেয় খুব।

কাজেই দেখ্‌চ উন্নত স্তরের প্রাণী ডিম পারে না, একেবারেই পরিণত কতকগুলি বাচ্চা প্রসব করে, আরেকটু উঁচু স্তরের যে গুলি, তারা একবারে একটির বেশী বাচ্চা প্রসব করে না। এ বিষয়টিও লক্ষ্য ক'র্‌বে, যে প্রাণী যত উন্নত, সন্তানের প্রতি ভালবাসাও তার তত বেশী। মানুষ হ'ল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী, তাই দেখ মানুষের বাপ-মা সন্তানদের কত ভালবাসে, কত যত্ন নেয়।

এখন হয়ত তুমি বুঝতে পেরেচ কেমন ক'রে নিম্ন প্রাণীর থেকে উন্নত হ'তে হ'তে আজকের দিনের শ্রেষ্ঠ মানুষের পরিণতি সম্ভব হয়েছে। সৃষ্টির প্রথম মানুষ আজকের দিনের মানুষের মত হয়ত মোটেই ছিল না। খুব সম্ভব তারা ছিল অর্দ্ধ-নর অর্দ্ধ-বানর ; আর তাদের বস-বাসের রীতিটাও হয়ত ছিল বানরের মতই। জার্ম্মেনীর হিডেলবার্গ সহরে এক অধ্যাপকের সাথে দেখা করেছিলাম, তোমার বোধ হয় মনে আছে। তিনি নানা রকমের ফসিলে (fossil) ভরা একটি ছোট্ট মিউসিয়াম আমাদের দেখিয়েছিলেন। আর বিশেষ ক'রে একটা নরমুণ্ড দেখিয়েছিলেন। এ-টা মানুষ-সৃষ্টির আদিম যুগের একটা নরমুণ্ড ব'লে সকলের ধারণা। তিনি তো খুব যত্ন ক'রে ওটাকে সিন্দুকে বন্ধ করে রেখেছিলেন। এ নর-মুণ্ডটা হিডেলবার্গের

নিকট মাটীর নীচে পাওয়া গেছে, তাই ওটাকে বলা হয় হিডেলবার্গ-মানুষ (Heidelberg Man) ; অবশ্য হিডেলবার্গ অথবা এমন কোন সহর আর সে দিনে নিশ্চয়ই ছিল না।

সেই প্রাচীন যুগে মানুষ যখন ঘুরে ঘুরে বেড়াত, পৃথিবীটা ছিল ভারী ঠাণ্ডা। সেই দিনে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এত বরফ ছিল যে সেই যুগটাকে বলা হয় 'তুষার যুগ'। আজকাল উত্তর মেরুতে যে রকম সব তুষার পর্ব্বত রয়েছে, সে রকম তুষার পর্ব্বত সে দিনে ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সে দিনকার জীবন যাত্রা মানুষের পক্ষে ছিল বড় কষ্টের, ওটা মানুষের ছিল বড় দুঃখের সময়। পৃথিবীর যে সব স্থানে তুষার পর্ব্বতগুলি ছিল না, কেবল সেই সব স্থানেই তাদের বাস করা সম্ভব ছিল।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, আজকের ভূমধ্যসাগরও সে দিনে মোটেই সাগর ছিল না—ওখানে ছিল কেবল গোটা দুই হ্রদ। লোহিত সাগর তো ছিলই না। সমস্তটা জুড়েই ছিল ডাঙ্গা। ভারতবর্ষের অধিকাংশই ছিল তখন একটা দ্বীপ। পাঞ্জাব আর যুক্ত প্রদেশের অনেকটাই ছিল সমুদ্রের মধ্যে। ভেবে দেখ-ত কেমন মজা—দক্ষিণ-ভারত আর মধ্য-ভারত মিলে হয়েছে একটা দ্বীপ, আর হিমালয় থেকে ওকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে একটা সাগর। সেই দিন মুসৌরী যেতে হ'লে কিন্তু তোমাকে খানিকটা ষ্টীমারে করে যেতে হ'ত।

আদি-মানব যে দিন পৃথিবীতে চোখ মেলে চাইল, সে দেখ্‌তে পেল তার চারদিকে সব অতিকায় জন্তু—ভয়ে ভয়ে

সে দিন কাটাত। আজ অবশ্য পৃথিবীতে মানুষ হয়েছে প্রভু, আর যত সব জন্তু তারা-ই তার দাস। ঘোড়া, গরু, হাতী, কুকুর, বিড়াল এরা মানুষের গৃহপালিত পোষা-জন্তু। বনের বাঘ, সিংহকে সে শীকার ক'রে আনন্দ পায়, আবার কোন কোন পশুকে সে মেরে খায়। সেই আদিম যুগে কিন্তু মানুষ প্রভু ছিল না, বরং সে ছিল শীকার, বড় বড় জন্তু জানোয়ারের ভয়ে সে পালিয়ে পালিয়ে ফিরত। ধাপে ধাপে মানুষ উন্নত হ'ল, আস্তে আস্তে সে শক্তিমান হ'ল, আর আজ দেখ সব প্রাণীর চেয়ে মানুষই বেশী শক্তিশালী। কেমন ক'রে এ সম্ভব হ'ল বলত? গায়ের জোরে নিশ্চয়ই নয়, কারণ হাতীর জোর মানুষের চেয়ে অনেক বেশী। তবে? মানুষ তার বুদ্ধি আর মস্তিষ্কের জোরেই এত উন্নত হয়েছে।

সেই প্রথম দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত মানুষের বুদ্ধির ক্রম-বিকাশের ধারাটা-ও আমরা জানি। বুদ্ধিবৃত্তিটা-ই মানুষকে অন্যান্য প্রাণীর থেকে ভিন্ন করেছে। বুদ্ধিহীন মানুষ আর পশুতে কি তফাৎ বল?

আগুন জ্বাল্‌তে পারা-ই মানুষের সব-প্রথমের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। আজকাল তো আমরা দিয়াশলাই দিয়ে আগুন জ্বালি। এই দিয়াশলাই কিন্তু খুব বেশী দিনের আবিষ্কার নয়। প্রাচীন যুগে দু'খানা পাথর ঘসে একটা আগুনের ফুল্কি বের করা হ'ত, সেই ফুল্কির আগুনে শুক্‌নো খড় কুটা ধ'রে বড় একটা আগুন জ্বালান হ'ত। পাথর অথবা অন্যান্য জিনিষের ঘসায় বনের

অধুনা-লুপ্ত অতিকায় হস্তী।

(The Mammoth)

সেই আদিম যুগে পৃথিবীতে মানুষ যখন প্রথম চোখ মেলে চেয়েছিল, সে দেখ্‌তে পেল তার চারদিকে সব অতিকায় জন্তু জানোয়ার, এদের ভয়ে সে পালিয়ে পালিয়ে ফির'ত। আর আজ? পৃথিবীতে সে কাকেই বা ডরায়?

ভিতর অনেক সময় আপনাথেকেই আগুন জ্বলে উঠে। এর থেকে কিছু শিখার মত বুদ্ধি অবশ্য পশুদের ছিল না। মানুষ তো পশুর চেয়ে বুদ্ধিমান, তাই সে সহজেই আগুনের উপকারিতাও বুঝ্‌ল। শীতের দিনে শরীর গরম করবার, আর যে সব বড় বড় জন্তু ছিল তাদের শত্রু, ওদেরও ভয় দেখিয়ে তাড়াবার একটা উপায় মানুষ খুঁজে পেল। কাজেই যখনই কোন রকমে একটা আগুন জ্বলে উঠ্‌ত, সবাই মিলে চেষ্টা কর্‌ত শুক্‌নো পাতা ফেলে ঐ আগুনটাকে জ্বালিয়ে রাখতে। আগুনটাকে নিভ্‌তে দিতে কেহই চাইত না। আস্তে আস্তে অবশ্য তারা নিজেরাই শিখে নিল কেমন ক'রে দুখানা পাথর ঘসে আগুন জ্বালতে হয়। এই মহান্‌ আবিষ্কারের ফলে পশুদের উপর তার একটু আধিপত্য হ'ল—পৃথিবী-জয়ের প্রথম সন্ধান সে পেল।

সাতের চিঠি

প্রস্তর-যুগ ও সেই যুগের মানুষ।

আগের চিঠিতে তোমাকে লিখেছি, মানুষের বুদ্ধিই মানুষকে পশুর চেয়ে ভিন্ন করেছে। এই বুদ্ধিই তাকে চতুর করেছে, শক্তিশালী করেছে, আর এই বুদ্ধিই অন্যান্য অতিকায় পশুর কবল থেকেও তাকে রক্ষা করেছে। মানুষের বুদ্ধির উন্নতির সাথে সাথে তার প্রভুত্বও বেড়ে গেল। প্রথম অবস্থায় তো শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবার মত কোন অস্ত্রই তার হাতে ছিল না—কেবল পাথর ছুড়েই যুদ্ধ কর্‌ত। তারপর মানুষ পাথর দিয়ে কুড়াল, বর্শা—এসব অস্ত্র তৈরী আরম্ভ কর্‌ল, পাথরের সরু সুঁচও তৈরী করেছিল। জেনিভা এবং South Kengsington Museumএ এরকম সব পাথরের অস্ত্র আমরা অনেক দেখেছি।

আমার আগের চিঠিতে যে তুষার যুগের কথা ব'লেছি, আস্তে আস্তে তার শেষ হ'য়ে এল। মধ্য এশিয়া ও ইউরোপের তুষার পর্ব্বতগুলি আস্তে আস্তে শেষ হ'য়ে গেল। আস্তে আস্তে পৃথিবীর আবহাওয়ার উষ্ণতাও বাড়্‌তে লাগ্‌ল, আর মানুষও পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ল।

সে দিনে কিন্তু বাড়ী, দালান-কোঠা কিছুই ছিল না—মানুষেরা বাস করত গুহার ভিতর। কৃষি অথবা মাঠের কাজ তাদের জানা ছিল না। ফল, বাদাম, আর শীকার-করা পশুর মাংস খেয়েই তারা জীবনধারণ করত। মাঠে তো আর শস্য জন্মিত না, কাজেই ভাত, রুটী তাদের খাদ্যের মধ্যে ছিল না। রান্না করতে তো আর তারা জানত না, রান্নার বাসন-কোসনও তাদের ছিল না—খাবার আগে মাংসটাকে হয়ত একটু আগুনে সেঁকে নিত।

এটা কিন্তু ভারী আশ্চর্য্যের বিষয়, এই আদিম যুগের অসভ্য মানুষেরাও আঁকতে জানত। তাদের চিত্রাঙ্কনের কাগজ, পেন্সিল, কলম, তুলি এ-সব অবশ্য কিছুই ছিল না; থাকবার মধ্যে ছিল কেবল পাথরের সূঁচ আর সরু সরু যন্ত্র। এ দিয়েই কিন্তু তারা গুহার গায়ে ছবি আঁকত, আর নানা রকমের দাগ কাটত। মাঝে মাঝে দেখা যায় একেকটা ছবি বেশ সুন্দর, তবে বেশীর ভাগ ছবিই রেখাঙ্কন। জানই তো এ রকম রেখাচিত্র আঁকা খুব সহজ, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এ রকম ছবিই আঁকে। গুহাগুলি তো ছিল নিশ্চয়ই খুব অন্ধকার, কাজেই মনে হয় সাদাসিধা ধরণের কোন রকমের প্রদীপ অথবা মশাল ওরা ব্যবহার করত।

যে সব মানুষের গল্প তোমাকে বললাম তাদের বলা হয় Palaeolithic অর্থাৎ আদি-প্রস্তর-যুগের মানুষ। এটাকে প্রস্তর-যুগ বলা হয়—কেন না, মানুষ সে দিনে কেবল পাথরের

ব্যবহারই জান্‌ত, আর পাথর দিয়েই তাদের অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী কর্‌ত। ধাতুর ব্যবহার তারা জান্‌ত না। আজকের দিনে তো আমাদের বেশীর ভাগ জিনিষই ধাতুর তৈরী, বিশেষতঃ লোহার। লোহা পিতলের ব্যবহার ঐ যুগের মানুষ জান্‌ত না, কাজেই পাথর দিয়ে কাজ করা কঠিন হ'লেও পাথরই ব্যবহার করা হ'ত।

এই প্রস্তর যুগ শেষ হ'বার আগেই পৃথিবীর আবহাওয়ার অনেক পরিবর্ত্তন হ'ল, পৃথিবীও অনেকটা উষ্ণ হ'ল। তুষার পর্ব্বতগুলি বহু দূরে আর্কটিক সাগর পর্য্যন্ত সরে গেল, আর মধ্য এশিয়া ও ইউরোপ খণ্ডে দেখা দিল মস্ত মস্ত বন জঙ্গল। এই বনগুলির মধ্যেই আরেক নূতন জাতির মানুষের বসবাস আরম্ভ হ'ল। আদি-প্রস্তর-যুগের (Palaeolithic) মানুষের চেয়ে এরা অনেক বুদ্ধিমান। কিন্তু এরাও পাথর দিয়েই তাদের যন্ত্রপাতি তৈরী কর্‌ত। এরাও প্রস্তর যুগের মানুষ। তবে এদেরে বলা হয় Neolithic অর্থাৎ নব-প্রস্তর-যুগের মানুষ।

এই নূতন প্রস্তর-যুগের মানুষদের পরীক্ষা কর্‌লে দেখা যায়, মানুষ এত দিনে আরো অনেক উন্নতি করেছে। অন্যান্য পশুদের তুলনায় এই মানুষদের বিশিষ্ট বুদ্ধি, তাদের অনেক তাড়াতাড়ি উন্নতির পথে এগিয়ে দিল। প্রস্তর যুগের এই নব পর্য্যায়ের মানুষেরাই প্রথম কৃষির উদ্ভাবন করে। মাটী চাষ ক'রে তারা শস্য জন্মাতে লাগ্‌ল। সেই যুগের মানুষের
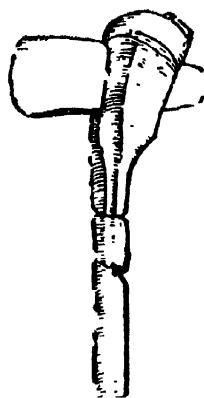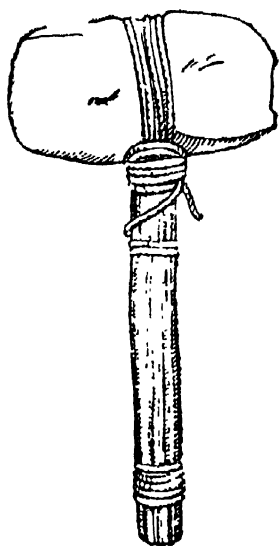
নব-প্রস্তর যুগের মানুষদের তৈরী অস্ত্র-শস্ত্র ও যন্ত্রপাতি

পক্ষে এটা একটা মস্ত ঘটনা। সব সময় খাদ্যের জন্য শীকারের চেষ্টা না ক'রে, খাদ্য তারা আরো অনেক সহজেই পেতে লাগ্‌ল। বিশ্রাম আর চিন্তা করবার অবকাশও তারা পেল প্রচুর। আর এই অবকাশ পেয়েই নূতন নূতন আবিষ্কার, উদ্ভাবনের দ্বারা নিজেদের উন্নত কর্‌বার সুযোগও তারা পেল। মাটীর বাসন তারা তৈরী কর্‌তে শিখ্‌ল, আর তার-ই সাহায্যে তাদের রান্না হ'ত। এই সময়ের পাথরের যন্ত্রগুলি অনেক ভাল ছিল, আর বেশ সুন্দর পালিশ করা-ও ছিল। গরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর—এদের তারা পোষ মানিয়ে নিল। আর পরণের কাপড় বুন্‌তেও তারা শিখেছিল।

এই যুগের মানুষ কুড়ে-ঘরে বাস কর্‌ত। এই কুড়ে-ঘরগুলি কোন হ্রদের মধ্যে নির্ম্মাণ করা হ'ত, যাতে বন্য পশু অথবা অন্য মানুষ তাদের আক্রমণ কর্‌তে না পারে। কাজেই এই লোকদের বলা হয় হ্রদবাসী।

এই লোকদের বিষয় এত সব কথা আমরা কেমন ক'রে জেনেছি, ভেবে তুমি নিশ্চয়ই ভারী আশ্চর্য্য হচ্ছ—তাদের লেখা কোন বই-ত আর আমাদের কাছে নেই? কিন্তু আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, এ সব মানুষের কাহিনী আমরা যে বই থেকে জেনেছি, সে হচ্ছে প্রকৃতির নিজের হাতের লেখা বই। কিন্তু এই বইখানা পড়া তো সহজ নয়। তার জন্য চাই অসীম ধৈর্য্য। এই বইখানা পড়বার চেষ্টায় বহু লোক তাদের সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা বহু ফসিল

আর পুরাকালের বহু ধ্বংসাবশেষ সংগ্রহ করেছেন। বড় বড় মিউসিয়মে এই সব ফসিল সংগ্রহ ক'রে রাখা হয়েছে। সেই সব মিউসিয়মে এই নব-প্রস্তর যুগের (Neolithic) মানুষদের তৈরী পালিশ করা কুড়াল, নানা রকমের পাত্র, পাথরের তীর, সূঁচ, এ রকম আরও সব জিনিষ তুমি দেখ্‌তে পাবে। এর অনেক জিনিষই তুমি দেখেছ, এখন হয়ত ভুলে গেছ। আবার দেখলে এখন নিশ্চয়ই আরো ভাল ক'রে বুঝ্‌বে।

আমার মনে আছে, জেনিভা মিউসিয়মে একটা হ্রদবাড়ীর সুন্দর নমুনা দেখেছিলাম। হ্রদের মধ্যে কাঠের খুঁটি পোতা, সেই খুঁটির উপর একটা মঞ্চ, আর ঐ মঞ্চের উপর কাঠের কুটীর সব নির্ম্মাণ করা হয়েছিল, এবং সমস্ত বাড়ীটা একটা কাঠের পুলের দ্বারা তীর সংলগ্ন ছিল।

এই নূতন প্রস্তর যুগের মানুষেরা পশুর চামড়া প'রে থাক্‌ত ; কখন কখনও বা flax এর তৈরী এক রকমের মোটা কাপড়ও পর্‌ত। flax এক রকমের ছোট গাছ, এর আঁশ থেকে বেশ কাপড় তৈরী হয়। এই flax থেকেই লিনেনের কাপড় তৈরী হয়। সেই দিনের flax এর তৈরী কাপড় যে খুব মোটা ছিল, তাতে অবশ্য সন্দেহ নাই।

মানুষ দিনে দিনে উন্নতির পথে এগিয়ে চল্‌ল। তারা তামা আর কাঁসার যন্ত্রপাতি তৈরী করতে আরম্ভ কর্‌ল। কাঁসা হ'ল তামা আর টীনের এক রকমের মিশ্র ধাতু, দু'টার চেয়েই বেশী শক্ত। সোণার ব্যবহারও তারা জান্‌ত, আর সোণার
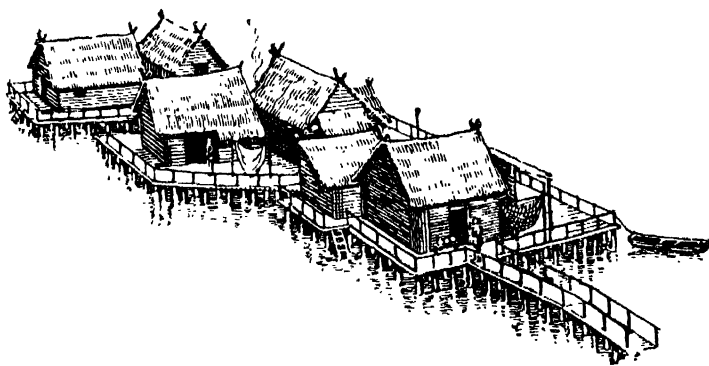
হ্রদ-পল্লী।

নব-প্রস্তর যুগের মানুষেরা আদি প্রস্তর যুগের মানুষদের মত গুহাবাসী ছিল না ; তারা কুড়ে ঘরে বাস ক'রত। এই কুটারগুলি প্রায়ই কোন হ্রদের মধ্যে নির্ম্মাণ করা হ'ত, যাতে বন্য পশু অথবা অন্যান্য মানুষ-শত্রু তাদের আক্রমণ ক'রতে না পারে।

[মডেল—জেনিভা মিউসিয়াম

গয়না প'রে গর্ব্ব কর্‌বার ভাবটাও তাদের মনে মনে বেশ ছিল।

যাদের কথা তোমাকে বল্‌লাম, তারা প্রায় ১০,০০০ হাজার বছর আগের মানুষ, একেবারে ঠিক সময়টা নিরূপণ ক'রে বলা অবশ্য খুবই মুস্কিল। বেশীর ভাগ অনুমানের উপরই নির্ভর কর্‌তে হয়। এর আগ পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ বছর আগের কথাই ব'লে এসেছি। এখন আমাদের নিজেদের যুগের কাছাকাছি এসে পড়েছি। প্রস্তর যুগের এই নব-পর্য্যায় থেকে আরম্ভ ক'রে বর্ত্তমান যুগের মানুষ পর্য্যন্ত ধারাবাহিকতার কোন ছেদ নেই, হঠাৎ কোন পরিবর্ত্তনও নেই। কিন্তু তবু এই দুই যুগের মানুষের মধ্যে বিস্তর তফাৎ। পরিবর্ত্তনটা এসেছে খুব ধীরে—প্রকৃতির নিয়মই এই। কতকগুলি বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হ'ল, আর প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ ধারায় জীবনের পথে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌ল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া বিভিন্ন, কাজেই প্রত্যেক দেশের মানুষই সেই সেই দেশের আবহাওয়ার আবেষ্টনে এক একটি বিভিন্ন জাতি হ'য়ে গেল। এই বিষয় নিয়ে পরে আরো বল্‌ব।

আরেকটা কথা তোমাকে আজ বল্‌ব। এই নূতন প্রস্তর-যুগের (Neolithic age) প্রায় শেষাশেষি মানুষের এক মহাবিপদ উপস্থিত হ'য়েছিল। তোমাকে তো এর আগেই বলেছি, সেই সময় এখনকার ভূমধ্যসাগর মোটেই সাগর ছিল না। সেখানে কয়েকটা হ্রদ ছিল, সেই হ্রদগুলির মধ্যে মানুষের বসবাস ছিল। হঠাৎ এক সময় ইউরোপ আর

আফ্রিকার মধ্যের জিব্রালটার দেশটা বন্যায় ভেসে গেল আর আটলান্টিকের জল নীচের উপত্যকায়, (এখনকার ভূমধ্য-সাগরে) গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। অবিশ্রাম গতিতে জল গড়াতে লাগ্‌ল; হ্রদের ভিতর, আর কাছাকাছি যত লোক ছিল, অনেকেই বন্যার জলে ভেসে গেল। কোথাও যে গিয়ে রক্ষা পাবে, তারও উপায় ছিল না—শত শত মাইল ব্যাপী সমস্ত দেশটাই তো একেবারে জলে জলময়। আটলান্টিকের জল সেই নীচু ভূমিতে অনবরত গড়াতেই লাগ্‌ল, তার থেকেই ভূমধ্যসাগরের সৃষ্টি হয়েছে।

তুমি তো এই প্রলয় বন্যার কথা নিশ্চয়ই শুনেছ, হয়ত পড়েও থাক্‌বে। বাইবেলে এর বিষয় লেখা আছে, আমাদের কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থেও এই কথার উল্লেখ আছে। মধ্য-ভূখণ্ড আটলান্টিকের জলে পূর্ণ হওয়া-ই হয়তো বা এই প্রলয় বন্যা। যে অল্প কয়জন লোক কোন রকমে বেঁচে গেল তারা নিশ্চয়ই এই মহাপ্রলয়ের কথা তাদের সন্তানদের কাছে বলেছিল, আর ওরাও সেই কাহিনীটা স্মরণ ক'রে রেখেছিল, তারাই আবার তাদের সন্তানদের সেই কথা বলেছিল। এ রকমেই কাহিনীটা পুরুষানুক্রমে চলে এসেছে।

ভিন্ দেশের ভিন্ জাতি।

এর আগের চিঠিতে নব-প্রস্তর-যুগের মানুষদের কথা বলেছি। এরা কিন্তু বেশীর ভাগই হ্রদবাসী ছিল। নানা দিকেই যে এই যুগের মানুষেরা অনেক উন্নতি করেছিল, তা দেখেছ। তারা কৃষির উদ্ভাবন করেছিল, রান্না কর্‌তে জান্‌ত, নিজেদের সুবিধার জন্য পশু পালনও কর্‌ত। এ কিন্তু বহু সহস্র বছর আগের কথা, কাজেই এ সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু জানা যায় না। পৃথিবীতে এখন যে সব বিভিন্ন জাতির মানুষ আছে তার বেশীর ভাগই হয়ত এই যুগের মানুষের বংশধর। তুমি তো জানই, পৃথিবীতে আজকাল আমরা যত সব মানুষ দেখ্‌চি, তাদের কেউ শ্বেত, কেউ পীত, কেউ বাদামী, আর কেউ বা কালো। অবশ্য মানুষের বিভিন্ন জাতিগুলিকে এই চারটি মূলভাগেই ভাগ করা সহজ নয়। বিভিন্ন জাতি মিশে গেছে, কাজেই অনেক জাতির বিষয়-ই ঠিক ক'রে বলা যায় না, তাদের কোন্ বিভাগে ফেল্‌ব। বৈজ্ঞানিকেরা মানুষের মাথাটা মেপে অনেক সময় বলে দিতে পারেন, কে কোন্ জাতির মানুষ। এটা স্থির কর্‌বার অন্য উপায়ও আছে।

এ-সব বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হ'ল কেমন ক'রে? তারা যদি একই মানুষের বংশধর, তবে আজকের দিনে তাদের মধ্যে এত বিভিন্নতা এসেছে কেন? তুমি তো জানই একজন জার্ম্মাণ, ও একজন নিগ্রোর মধ্যে আকৃতির কত তফাৎ। একজনের গায়ের রং সাদা, আরেক জনের কালো। জার্ম্মাণের চুল লম্বা, ফিকে রংএর; নিগ্রোর চুল খাট, কোকরান, আর কালো রংএর। একজন চীনাম্যান কিন্তু এদের উভয়ের চেয়েই একেবারে ভিন্ন। এই বৈষম্য যে মানুষের মধ্যে কেমন ক'রে ঢুক্‌ল বলা মুস্কিল, তবে কয়েকটা কারণ অবশ্য আমরা জানি। নিজেদের পারিপার্শ্বিকের উপযোগী কর্‌বার জন্য কেমন ক'রে যে ক্রমে ক্রমে প্রাণীর আকারের পরিবর্ত্তন ঘটে, সে কথা তোমাকে বলেছি। হয়তো একজন জার্ম্মেন ও একজন নিগ্রো বিভিন্ন শ্রেণীর বংশধর, কিন্তু খুব সম্ভব একদিন তাদের উভয়ের-ই পূর্ব্বপুরুষ ছিল একই মানুষ। এই প্রাকৃতিক ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলেই হয়ত মানুষের মধ্যে আকারের বৈষম্য ঘটেছে; অথবা এ-ও বল্‌তে পার, এক এক দেশে প্রাকৃতিক আবহাওয়া অনুযায়ী সেই সেই দেশের মানুষের শরীর গঠিত হয়েছে অর্থাৎ যার যার দেশের আবহাওয়া, তার তার সহজে সহ্য হয়।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি—যে ব্যক্তি পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে তুষার-প্রদেশে ভীষণ হিমে বাস করে, ঠাণ্ডা সহ্য কর্‌বার শক্তি সে অর্জ্জন কর্‌বেই। এস্কিমো জাতির কথা ধর,—এদের বাস পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে যেখানে বছরের বারো মাসই দেশটা

থাকে বরফে ঢাকা। এরা তো শীত খুব সহ্য কর্‌তে পার্‌বেই—গরম মোটেই সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না। আমাদের মত গরম দেশে ওদের নিয়ে আস্‌লে ওরা হয় তো ম'রেই যাবে। তারা পৃথিবীর অন্য সব দেশের চেয়ে একেবারে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছে, আর তাদের জীবন-যাপনও কর্‌তে হয় বড় কষ্টে; কাজেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষদের মত আজও তারা জ্ঞান লাভ কর্‌তে পারে নাই। আফ্রিকা আর বিষুব-রেখার কাছাকাছি দেশগুলি তো ভীষণ গরম, কাজেই সে সব দেশের লোকদের আবার গরমটা খুব সহ্য হয়। সূর্য্যের প্রখর কিরণে তাদের গায়ের রং একেবারে হয়ে গেছে কালো। সমুদ্রের পাড়ে অথবা অন্য কোথাও যদি তুমি অনেকক্ষণ ধ'রে বাইরে বাইরে রোদে কাটাও, দেখ্‌বে, তোমার গায়ের রংটা হ'য়ে যাবে অনেকটা তামাটে, আর তোমার গায়ের আসল যে রং, তার চেয়ে অনেক মলিন হ'য়ে যাবে। এ রকম কয়েক সপ্তাহের 'সূর্য্য স্নানের' ফলেই যদি তোমার রং মলিন হ'য়ে যায়, তবে ভেবে দেখ তো যাকে সব সময় বাইরে কাটাতে হয়, তার অবস্থা কি হ'বে? আবার শত শত বৎসর ধ'রে পুরুষানুক্রমে যদি কোন জাতি গরম দেশেই বসবাস কর্‌তে থাকে, তারা তো আস্তে আস্তে কালো হ'তে হ'তে একেবারেই কালো হ'য়ে যাবে। আমাদের ভারতবর্ষের কৃষকদের তো দেখেছ, তারা দুপুরের রোদে মাঠে কাজ করে। তারা এত দরিদ্র যে, যথেষ্ট কাপড়-চোপড় পর্‌বার মত অর্থ তাদের নেই, কাজেই পরণেও আছে তাদের

খুবই কম কাপড়। সারাটা শরীরেই তাদের রোদ লাগে, আর জীবনের সব দিনগুলিও তারা এম্‌নি কাটিয়ে দেয়। কাজেই তাদের গায়ের রং যে কালো হবে তা তো বুঝ্‌তেই পার।

এখন হয়ত বুঝেছ, দেশের প্রাকৃতিক অবস্থানুযায়ী মানুষের গায়ের রং বদলায়। তার যোগ্যতা, তার ভালত্ব অথবা তার অঙ্গ-সৌষ্ঠব তার গায়ের রংএর উপর মোটেই নির্ভর করে না। একজন গৌরবর্ণ লোক যদি বহু কাল ধ'রে গরমের দেশে রোদের আড়াল হ'য়ে না থাকে, তার রং কালো হ'য়ে যাবেই। তুমি তো জান আমরা কাশ্মীরী, দু'শ বছরেরও আগে আমাদের পুর্ব্বপুরুষদের বাড়ী ছিল কাশ্মীর। কাশ্মীরে দেখেছ সবাই এমন কি কৃষক মজুরেরা-ও দেখতে খুব ফর্সা। এর কারণ হয়েছে কাশ্মীর ঠাণ্ডার দেশ। আবার এই গৌরবর্ণ কাশ্মীরীরা-ই ভারতবর্ষের অন্য কোন গরম প্রদেশে কয়েক পুরুষ ধ'রে বসবাস কর্‌লে কালো হ'য়ে যাবে। আমাদের কাশ্মীরী বন্ধুদের মধ্যেই কেহ কেহ বেশ ফর্সা, আবার কেহ কেহ খুব কালো। যে কাশ্মীরী পরিবার যত বেশী দিন গরমের দেশে বসবাস কর্‌বে, তাদেরই তত বেশী কালো হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা।

কাজেই দেখ মানুষের গায়ের রংএর বিভিন্নতার প্রধান কারণ হয়েছে প্রাকৃতিক আবহাওয়া। অবশ্য এমন লোকও তো আছে যারা গরম দেশে বাস কর্‌লেও কখনও বাহিরে বের হ'য়ে কাজ-কর্ম্ম করে না, বড় বড় বাড়ীতে বাস করে আর নিজের শরীর আর গায়ের রংএর তদ্বির কর্‌বার জন্য প্রচুর টাকা

পয়সাও খরচ করে। কোন ধনী পরিবার যদি এ রকম ভাবেই জীবন কাটায়, তবে প্রাকৃতিক আবহাওয়ার প্রভাব এড়িয়ে চলাও তাদের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু নিজের হাতে কাজ-কর্ম্ম না ক'রে পর-নির্ভর হওয়ার মধ্যে যে গর্ব্ব কর্‌বার কিছুই নাই তা' তো বুঝই।

কাশ্মীর, পাঞ্জাব আর ভারতবর্ষের উত্তরাংশের লোকেরা যে সাধারণতঃ ফর্সা হয়, তা' তো দেখেছ। কিন্তু যতই দক্ষিণদিকে যাবে, ততই দেখবে, সেই সব দেশের লোকের গায়ের রং তত কালো। মাদ্রাজ আর সিংহলের লোকেরা তো খুবই কালো। এ যে কেবল প্রাকৃতিক আবহাওয়ার দরুণই এ রকম হয়েছে, এ কথা তুমি নিশ্চয়ই বল্‌বে, কারণ যতই দক্ষিণে বিষুবরেখার কাছাকাছি যাওয়া যায়, আবহাওয়াও ততই গরম বোধ হয়। কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের লোকদের গায়ের রংএর বিভিন্নতার এই-ই প্রধান কারণ। এর পরে তোমাকে আরেকটা বিষয় বল্‌ব,—প্রাচীন কালে যে সব বিভিন্ন জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল, তাদের মৌলিকত্বের বিভিন্নতাও অবশ্য এর জন্য কতকটা দায়ী। প্রাচীন কালে বহু বিভিন্ন জাতি ভারতবর্ষে এসেছিল, আর বহু দিন পরস্পর না মিশে থাক্‌বার চেষ্টাও তারা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা আর অবশ্য সম্ভব হয় নাই। আজকাল আর জোর ক'রে কারুর সম্বন্ধেই বলা চলে না যে, সে একটা মূল জাতির বংশধর।

বিভিন্ন জাতি ও তা'দের ভাষা।

পৃথিবীর কোন্ অংশে যে মানুষের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল তা'বলা মুস্কিল, কোন্ দেশটা যে মানুষের আদি বাস-ভূমি তা'ও বলা যায় না। হয়তো পৃথিবীর নানা অংশে প্রায় একই সময়ে মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল। খুব সম্ভব তুষার-যুগের তুষার পর্ব্বতগুলি গ'লে গ'লে যখন উত্তর দিকে স'রে যাচ্ছিল, মানুষ তখন অপেক্ষাকৃত গরম দেশে বাস করত। তার পর বরফের পর্ব্বতগুলি স'রে যাবার পর পেছনে র'য়ে গেল, গাছপালাহীন কতকগুলি সমতল প্রান্তর, কতকটা সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা-ভূমির মত। ঐ সব প্রান্তরগুলি আস্তে আস্তে ঘাসে ভ'রে গেল, আর মানুষেরা তাদের গৃহপালিত পশুদের ঘাসের জন্য এ সব স্থানের আসে-পাশে ঘুরে বেড়াতো। এ সব মানুষ যাদের থাকবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না, আর সব সময় কেবল ঘুরে বেড়াত, তাদের বলা হয় 'যাযাবর'। ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর আরো নানা জায়গায় এ-সব 'যাযাবর' জাতি এখনও দেখা যায়, এদের ইংরেজীতে বলা হয় Gypsy.

মানুষেরা বড় বড় নদীর তীরেই বসবাস সুরু করেছিল, কারণ নদীর উপকূলের জমিই খুব উর্ব্বর, কাজেই কৃষির পক্ষেও খুব উপযোগী। জলের প্রাচুর্য্য হেতু ঐ রকম সব স্থানেই শস্য জন্মান সহজ ছিল। কাজেই আমাদের মনে হয়, ভারতবর্ষে, গঙ্গা আর সিন্ধুর উপকূলে, মেসোপোটামিয়ায়, টাইগ্রীসের উপকূলে, মিশরে, নাইলের উপকূলে, আর চীন দেশেও এমনি বড় বড় নদীর তীরেই মানুষেরা প্রথম বসবাস সুরু করেছিল।

ভারতের যে সব প্রাচীন জাতির কথা আমরা কিছু জানি, তাদের মধ্যে দ্রাবিড় জাতির নামই প্রথম বল্‌তে হ'বে। আর্য্য এবং মোঙ্গলেরা ভারতবর্ষে এসেছিল এই দ্রাবীড়দের পরে—উত্তর দিক দিয়ে ঢুকেছিল আর্য্যরা, আর পূবদিক দিয়ে মোঙ্গলেরা। আজকালও, দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীই কিন্তু দাবীড়দের বংশধর। দ্রাবীড়েরা ভারতবর্ষে বেশী দিন আছে বলেই হয়ত উত্তর ভারতের লোকদের চেয়ে তাদের গায়ের রং বেশী কালো। এই দ্রাবীড় জাতিটী খুব সভ্য ছিল। তাদের নিজেদের ভাষা ছিল, আর অন্য দেশের লোকদের সাথে এরা ব্যবসা-বাণিজ্যও করত। যাক্ এ-সব পরের কথা।

সেই আদিম যুগে, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় এবং পূর্ব্ব ইউরোপে একটি নূতন জাতির পরিণতি আরম্ভ হয়েছিল। এদের বলা হয় আর্য্য জাতি। সংস্কৃত ভাষায় এই আর্য্য শব্দটীর অর্থ ভদ্র অথবা উচ্চবংশোদ্ভব। আবার এই সংস্কৃত ভাষা কিন্তু আর্য্য-ভাষাগুলিরই অন্যতম, কাজেই মনে হয়, আর্য্যগণ

নিজেদের মনে কর্‌ত খুব ভদ্রলোক আর উচু বংশের।

এরা খুব গর্ব্বিত জাতি ছিল—আজকালকার মানুষের মতই আর-কি! জানইত, ইংরেজেরা মনে করে পৃথিবীতে তারাই প্রধান জাতি, ফরাসীদেরও নিশ্চিত ধারণা তারাই শ্রেষ্ঠ, আর জার্ম্মেন, আমেরিকান এবং অন্যান্য সব জাতি, তারাই কেন বাদ যায়, তাদের ধারণাও ঠিক ঐ।

এই আর্য্যগণ উত্তর এশিয়ার এবং ইউরোপের বিস্তৃত তৃণ-ভূমির চারদিকে ঘুরে বেড়াত। জন-সংখ্যা তাদের ক্রমেই বৃদ্ধি হ'তে লাগ্‌ল, আবহাওয়াটা-ও আস্তে আস্তে শুক্‌নো হ'তে লাগ্‌ল, ঘাস কমে গেল, আর সবাইর উপযোগী খাদ্যেরও অভাব পড়ে গেল। কাজেই খাদ্যের খোঁজে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় তাদের বাধ্য হ'য়ে-ই স'রে যেতে হ'ল। তারা ইউরোপের সমস্তটা ছেয়ে গেল, আর কেউবা এল ভারতবর্ষে আর কেউবা গেল পারস্য, মেসোপোটামিয়ায়। কাজেই দেখ ইউরোপ, উত্তর ভারত, পারস্য ও মেসোপোটামিয়ার প্রায় সবগুলি জাতিই, দেখ্‌তে আজ এত ভিন্ন হ'লেও আসলে এক আর্য্য জাতির-ই বংশধর। অবশ্য এ বহু দিন আগেকার কথা; সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত অনেক ঘটনাই ঘটেচে, আর সবগুলি জাতি-ই বহুল পরিমাণে মিশেও গেছে। এই আর্য্যরাই পৃথিবীর বহু জাতির পূর্ব্বপুরুষ।

মোঙ্গলরা আরেকটা বড় জাতি। এরা পূর্ব্ব এশিয়ার চীন, জাপান, তিব্বত, শ্যাম এবং ব্রহ্মদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এদের অনেকে বলে পীত জাতি। এদের দেখ্‌বে, চোয়ালের হাড় সাধারণতঃ উঁচু, আর চোখ দু'টা ছোট।

আফ্রিকা এবং আরো কোন কোন দেশে কাফ্রীদের বাস। এরা না আর্য্য, না মোঙ্গল, গায়ের রং এদের ঘোর কৃষ্ণ। আরব দেশের আরব জাতি ও পেলেষ্টাইনের হিব্রু জাতি আবার আরেকটা ভিন্ন জাতি।

এই সবগুলি জাতিই হাজার হাজার বছরের পরিবর্ত্তনের ফলে বহু শাখা-জাতিতে ভাগ হ'য়ে গেছে এবং কতকটা মিশ্রিতও হ'য়ে গেছে। যাক্ এ নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামালেও চল্‌বে। এ-সব জাতির পাঁতি ঠিক কর্‌বার একটা প্রধান আর মজার উপায় হচ্ছে, তাদের ভাষা নিয়ে আলোচনা করা। প্রত্যেক জাতির-ই প্রথম অবস্থায় একেকটা নিজস্ব আলাদা ভাষা ছিল, আস্তে আস্তে আবার সেই মূল ভাষাগুলি থেকেই অনেকগুলি ক'রে উপ-ভাষার সৃষ্টি হ'ল। এই উপ-ভাষাগুলি কিন্তু এক একটা মূল ভাষার-ই পরিণতি এবং বলা যায় এক-পরিবার ভুক্ত। এই সব বিভিন্ন ভাষার মধ্যে কতকগুলি সাধারণ শব্দ পাওয়া যায়, এবং তা থেকেই বিভিন্ন ভাষার সম্বন্ধটাও নির্ণয় করা যায়।

আর্য্যরা যখন সমস্তটা এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে ছড়িয়ে পড়্‌ল, তাদের পরস্পরের সম্বন্ধও একেবারে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল—সে দিনে তো আর রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ, ডাকঘর অথবা লেখা কোন বই ছিল না,—তাই।

আর্য্যদের বিভিন্ন দলগুলি, কিন্তু, মূল-ভাষাটাকেই বিভিন্ন ভঙ্গীতে ব'ল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌ল, কাজেই কিছু কাল পরে, আর্য্যদের বিভিন্ন দেশের জ্ঞাতি-ভাষাগুলির মধ্যেও পরস্পর আর কোন সাদৃশ্য রইল না। এই কারণেই পৃথিবীতে আজ এতগুলি বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হ'য়েছে।

এই বিভিন্ন ভাষাগুলি আলোচনা ক'রে কিন্তু আমরা দেখেছি, এদের সংখ্যা এত বেশী হ'লেও, মূল ভাষা মাত্র অল্প কয়েকটি। কারণ, বুঝতেই পার, আর্য্যগণ যে যে দেশে গিয়েছিলেন, সেই সেই দেশের ভাষাগুলিও মূল আর্য্য ভাষারই অন্তর্গত। সংস্কৃত, ল্যাটীন, গ্রীক, ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মান, ইতালীয় এবং আরো কতকগুলি ভাষা সব জ্ঞাতি-ভাই— মুল আর্য্য ভাষার সন্ততি। আমাদের ভারতবর্ষের অনেক ভাষা, যেমন, হিন্দি, বাংলা, মারাঠী, গুজরাটী, এগুলি সব সংস্কৃত-মূলীয়, কাজেই এদের গোত্রও আর্য্য। চৈনিক ভাষারও একটা মস্ত পরিবার আছে। চীনা, বর্ম্মী, তিব্বতী আর শ্যাম-ভাষা এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় আরেকটা পরিবার হ'ল সেমিটিক, আর্ব্বি আর হিব্রু এর অন্তর্গত। আবার কয়েকটা ভাষা, যেমন তুর্কী, জাপানী এদের কিন্তু আগের ঐ তিনটী ভাষার কারো সাথেই কোন সম্পর্ক নেই।

দক্ষিণ ভারতের কয়েকটী ভাষা' যেমন তামীল, তেলেগু, মালয়ালাম এবং কানারী এরাও' ঐ সব পরিবারের সাথে সম্পর্ক-বিহীন। এই চারটীই খুব প্রাচীন দ্রাবীড় পরিবারের।

দশের চিঠি

বিভিন্ন ভাষার সম্পর্ক।

আর্য্যগণ যে পৃথিবীর নানা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল তা' বলেছি, তাদের তখনকার ভাষাটা যে কি রকম ছিল, তা' অবশ্য আমাদের জানা নেই; তবে বুঝতেই পারচ, তাদের ঐ ভাষাটা-ও তারা সাথে ক'রে নানা দেশে নিয়ে গেল। তার পর বিভিন্ন আবহাওয়া আর বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থার আবেষ্টনে আর্য্যদের বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে নানা রকমের পরিবর্ত্তন এসে গেল। কোন দলের সাথে কোন দলেরই আর সম্পর্ক রইল না, কাজেই প্রত্যেকটা দলই যার যার ভাবে, আচার-ব্যবহারে, পরিবর্ত্তিত হ'তে লাগ্‌ল। সে দিনে ভ্রমণটা ছিল বড় কষ্টের, কাজেই একবার ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেলে কোন দলের সাথে কোন দলের আর কখনো দেখা সাক্ষাৎ-ই হ'ত না। কোন দেশের লোক নূতন একটা কিছু আবিষ্কার ক'র্‌লে, সে কথা অন্য দেশের লোকদের জানাতেও পার্‌ত না। এম্‌নি ভাবেই পরিবর্ত্তন সুরু হ'ল এবং কয়েক পুরুষ পরে একেকটা পরিবার বহু অংশে ভাগ হ'য়ে যেতে লাগ্‌ল। সম্ভবতঃ তারা ভুলেও গেল যে, তারা সবাই একটা মস্ত পরিবারের বংশধর। আবার

একেকটা ভাষা থেকেও অনেকগুলি ক'রে নূতন ভাষার সৃষ্টি হ'তে লাগ্‌ল, আর কোনটার সাথে কোনটার মিলও রইল না।

দেখ্‌তে ভাষাগুলি এত ভিন্ন হ'লেও তাদের মধ্যে কতকগুলি একই রকমের শব্দ, আর কতকটা সাদৃশ্যও অবশ্য র'য়ে গেল। বহু সহস্র বছর পরেও ঐ এক-রকমের শব্দগুলি আজ পর্য্যন্তও বিভিন্ন ভাষায় পাওয়া যায়। এই থেকেই মনে হয়, এই বিভিন্ন ভাষাগুলির গোড়াতে, একটা ভাষা-ই রয়েছে। তুমি তো জান ফরাসী আর ইংরেজী ভাষায় এক রকমের অনেকগুলি সাধারণ শব্দ আছে। খুব নিত্য ব্যবহৃত দু'টা ইংরেজী শব্দ ধর—father, mother; হিন্দি ও সংস্কৃতে এদের বলা হয় 'পিতা' 'মাতা'; ল্যাটীনে বলা হয় 'Pater' 'Mater'; গ্রীক ভাষায় বলা হয় 'Pater' 'Meter'; জার্ম্মান ভাষায় বলা হয় 'Vater' (উচ্চারণ Fater) 'Mutter'; ফরাসী ভাষায় বলা হয় 'Pere' 'Mere'. অন্যান্য অনেক ভাষায়-ও ঠিক এম্‌নি ধারা শব্দই রয়েছে। এদের তো মনে হয় যেন একই রকমের শব্দ,—কেমন না? সবগুলিই যেন এক পরিবারের জ্ঞাতি-ভাই। অনেক শব্দই অবশ্য এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় ধার করা হ'য়েছে। ইংরেজী থেকে অনেক শব্দ হিন্দি ভাষায় এসেছে, আবার তেমনি হিন্দি থেকেও অনেক শব্দ ইংরেজী ভাষায় গিয়েছে। কিন্তু 'পিতা' 'মাতা' বুঝাবার জন্য, দু'টা শব্দ অবশ্যই কেহ কারুর কাছ থেকে ধার করে নাই,

আর শব্দ দুটাও নূতন নয়। মানুষ প্রথম যে দিন থেকে কথা বল্‌তে শিখেছে, পিতা-মাতাকে বুঝাবার জন্য দু'টা শব্দও সেদিন থেকেই সৃষ্টি হ'য়েছে। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা চলে এ দু'টা ধার-করা শব্দ নয়। এই শব্দ দু'টা একই পরিবার, আর একই পূর্ব্বপুরুষদের কাছ থেকে চ'লে এসেছে। এর-থেকেই মনে হয়, বহু জাতি, যারা আজ ভিন্ন ভিন্ন দেশে বহু দূরে দূরে বাস ক'র্‌চে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বল্‌চে, একদা তাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সকলেই ছিল এক পরিবারের। দেখ্‌লে তো, এসব বিভিন্ন ভাষার কথা আলোচনা ক'রে কেমন আনন্দ পাওয়া যায়, কত কিছু শিক্ষা করা যায়। তিন চারটা ভাষা যদি তুমি শিখে নিতে পার, আরো কয়েকটাও খুব সহজেই শিখে নিতে পার্‌বে।

কাজেই দেখ, পৃথিবীর বহু জাতি, যারা আজ বহু দূরে দূরে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস কর্‌চে, তারাই বহু পূর্ব্বে একটা জাতি ছিল। সে দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত অনেক পরিবর্ত্তনই মানুষের হ'য়েচে, আর সাথে সাথে আমাদের পুরাণো আত্মীয়তাটা-ও আমরা অনেকেই ভুলে গেচি। সব দেশের মানুষই মনে করে দুনিয়ার সেরা, আর সব চাইতে চতুর জাতি তারা-ই, আর কারো সাথেই তাদের তুলনা চলে না। ইংরেজ মনে করে সে আর তার দেশ সবাইর সেরা; ফরাসীর তো ফ্রান্স, আর ফ্রান্সের যত কিছু সব নিয়েই গর্ব্ব; জার্ম্মান, ইটালীয়ানরাও যার যার নিজের দেশের কথা ভাবতে অজ্ঞান;

আবার অনেক ভারতবাসীও মনে করে, অনেক বিষয়ে ভারতবর্ষই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এ আত্মাভিমান ছাড়া কিন্তু আর কিছুই নয়। প্রত্যেকেই তার জাতি আর দেশকে শ্রেষ্ঠ বল্‌তে চায়। দুনিয়ায় সব মানুষই যেমন ভালো মন্দে মিশানো, পৃথিবীর সব দেশও আবার তেম্‌নি। কোন দেশই নিছক ভাল-ও নয়, নিছক মন্দ-ও নয়। ভালোর সন্ধান যেখানেই পাবে, সেখান থেকেই তাকে গ্রহণ কর্‌বে; মন্দ যেখানেই দেখ্‌বে নিঃসঙ্কোচে তাকেও পরিহার কর্‌বে। আমাদের স্বদেশ ভারতবর্ষই অবশ্য আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় হ'বে। দুঃখের কথা, আমাদের দেশের আজ বড় দুরবস্থা। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোকই বড় দরিদ্র, বড় দুঃস্থ। জীবনে তাদের এক ফোটাও আনন্দ নেই। দরিদ্র ও দুঃস্থ যারা, তাদের কেমন ক'রে সুখী করা যায়, তাই আমাদের দেখ্‌তে হ'বে। আমাদের রীতি-নীতির যেটুকু ভাল সেটুকু তো আমরা রাখ্‌বই, আর যা কিছু খারাপ তাকেও পরিত্যাগ ক'র্‌ব। অন্য দেশের যেটুকু ভাল সেটুকুও অবশ্যই অমরা গ্রহণ ক'র্‌ব।

ভারতবাসী হিসাবে ভারতবর্ষেই আমাদের বাস কর্‌তে হ'বে, আর এই দেশের জন্যই আমাদের কাজও কর্‌তে হ'বে। কিন্তু এ ভুলে গেলেও আমাদের চল্‌বে না, পৃথিবীর একটা মস্ত পরিবারের মানুষ আমরা সবাই, আর অন্য সব দেশের মানুষও আমাদেরই ভাই। 'পৃথিবীর সব মানুষই যদি সুখে শান্তিতে

থাক্‌তে পেত, পৃথিবীটা তবে কি আনন্দেরই না হ'ত! পৃথিবী যাতে একটী সুখ-নিকেতন হয়, সেই চেষ্টাই আমাদের করতে হ'বে।

এগারোর চিঠি

সভ্যতা কি ?

এবার প্রাচীন সভ্যতার কথা কিছু বল্‌ব। কিন্তু সভ্যতা অর্থে কি বুঝায় তাই আগে দেখা যাক্‌। অভিধান খুঁজে দেখ্‌বে সভ্য হওয়া মানে উন্নত হওয়া, মার্জ্জিত হওয়া, অভদ্র রীতিনীতির পরিবর্ত্তে ভদ্র আচার গ্রহণ করা। আর এই 'সভ্যতা' শব্দটী বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয় কোন সমাজ অথবা কতকগুলি দলবদ্ধ লোক সম্বন্ধে। যে অসভ্য অবস্থায় মানুষ প্রায় পশুর মতো জীবন যাপন করে, তাকে বলা হয় বর্ব্বরতা। এর ঠিক উল্টো অবস্থাটাই সভ্যতা। বর্ব্বর অবস্থা থেকে যত উন্নত হওয়া যায়, ততই আমরা সভ্যতার পথেও এগিয়ে যাই।

কিন্তু আসল কথা, কেমন ক'রে বুঝ্‌ব কোনো একজন মানুষ অথবা কোনো একটা সমাজ বর্ব্বর কি সভ্য ? ইয়োরোপের অনেক লোকই তো মনে করে তারা নিজেরা খুব সভ্য, আর এসিয়ার যত লোক সব অসভ্য, বর্ব্বর। হয়ত, এশিয়া ও আফ্রিকার লোকদের চেয়ে ইয়োরোপের লোকেরা বেশী কাপড় চোপড় ব্যবহার করে ব'লেই তাদের এই ধারণা। কিন্তু কাপড় চোপড় পরবার রকমটাতো নির্ভর করে দেশ আর

আবহাওয়ার উপর—ঠাণ্ডার দেশের লোকেরা গরম দেশের লোকদের চেয়ে বেশী কাপড় পরে। অথবা, কে জানে এ-ও হ'তে পারে, যাদের হাতে বন্দুক আছে তারা, যারা অস্ত্রহীন, তাদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ব'লেই নিজেদের বেশী সভ্য-ও মনে করে। যে শক্তিশালী, তাকে সভ্য ব'লে স্বীকার না করা তো দুর্ব্বলের পক্ষে যথেষ্ট ভয়ের কারণ,—বন্দুকধারীর কাছে প্রাণের মায়াটা তো ক'র্‌তে হয়।

তুমি তো শুনেছ, অল্প কয়েক বছর আগেই ইয়োরোপে একটা ভীষণ যুদ্ধ হ'য়ে গেছে। পৃথিবীর অনেক জাতিই এ যুদ্ধে নেমেছিল, আর প্রত্যেকেরই চেষ্টা ছিল, অপর পক্ষের কত লোক কে হত্যা ক'র্‌তে পারে। ইংরেজ তো তার যথা-সাধ্য জার্ম্মাণদের হত্যা কর্‌বার সুযোগে ছিল, আর জার্ম্মাণরা-ও ইংরেজদের হত্যা ক'র্‌তে কসুর করে নাই। লক্ষ লক্ষ লোক এই যুদ্ধে হত হ'য়েছে, আর বহু সহস্র লোক চির-জীবনের তরে পঙ্গু হ'য়ে রয়েছে। কারো কারো দুটী চোখ-ই নষ্ট হ'য়ে একেবারে অন্ধ হ'য়ে গেছে, কারো হাত নাই, কারো বা পা নাই। ফ্রান্সে এবং অন্যান্য দেশে এরূপ 'যুদ্ধে আহত' (Mutiles de la guerre) অনেক লোকই তুমি দেখেছ। প্যারী সহরের মাটীর নীচের ম্যাট্রো রেলওয়েতে এসব লোকদের বস্‌বার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত রয়েছে। তুমি কি মনে কর, এ রকম ভাবে পরস্পরকে হত্যা করার মধ্যে কোনো সভ্যতা অথবা বুদ্ধির প্রকাশ পেয়েছিল? রাস্তায় দাঁড়িয়ে

দু'জনে ঝগড়া ক'র্‌লে পুলিশ এসে তাদের ছাড়িয়ে দেয়; লোকেও মনে করে তাদের মূর্খ। কিন্তু ভেবে দেখ তো দু'টা গোটা দেশ আর জাতির পক্ষে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লড়াই করা, আর সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণবধ করা, আরো কত বড় বোকামী, আর কত বড় মূর্খতা। এ যেন জঙ্গলের ভিতর দুটো বুনো লোকের লড়াই। বন্য লোকদের বলা হয় বর্ব্বর, কিন্তু যে সব জাতি ঠিক এম্‌নি ভাবেই বিরোধ করে, তাদেরই বা এর বেশী আর কি বলা যায়?

কাজেই প্রশ্নটা যদি এদিক থেকে বিচার ক'রে দেখ, তবে বুঝ্‌বে, গত যুদ্ধে, ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী, ফ্রান্স, ইটালী এবং অন্যান্য যে সব জাতি খুন আর লড়াই ক'রেছে, তাদের কেহই সভ্য নয়। কিন্তু আবার একথাও খুবই সত্য, এসব দেশেই কত সুন্দর জিনিষ আছে, আর কত সব মহৎ লোকও রয়েছেন।

তুমি হয়তো এখন বল্‌বে, সভ্যতার অর্থ বুঝা কঠিন। তা সত্যি, এ একটা কঠিন প্রশ্নই বটে। সুন্দর সুন্দর দালান, সুন্দর সুন্দর ছবি, ভালো ভালো বই এবং যা কিছু সুন্দর সুচারু, সবই সভ্যতার লক্ষণ সন্দেহ নাই, কিন্তু এর চেয়েও ভাল লক্ষণ হচ্ছে স্বার্থ-লেশ শূন্য মহৎ মানুষ, যিনি সর্ব্ব লোকের হিতার্থে সবাইর সঙ্গে এক যোগে কাজ করেন। একা একা কাজ করার চেয়ে এক সঙ্গে কাজ করা ভাল, আর সকলের হিতের জন্য একতাবদ্ধ হ'য়ে কাজ করা সব চেয়ে ভাল।

বারোর চিঠি

সভ্যতার প্রথম ধাপ—মানুষের দল-গঠন।

আমার আগের চিঠিগুলিতে তোমাকে এই কথা বলেছি যে, মানুষের যখন পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভাব হয়, তার জীবন-যাত্রার রীতিটা ছিল অনেকটা পশুর মতো। আস্তে আস্তে বহু সহস্র বছরের পরিণতির ফলে সে একটু একটু ক'রে উন্নত হ'তে লাগ্‌ল। এখনকার অনেক বন্য পশুর মতোই প্রথম অবস্থায় সে-ও একাই শীকার ক'র্‌তে বের হ'ত। আস্তে আস্তে অবশ্য সে বুঝ্‌ল, কয়েকজন মিলে এক সঙ্গে শীকার ক'র্‌তে যাওয়াই অনেক নিরাপদ। দলবদ্ধ অবস্থায় তাদের শক্তিও বেড়ে যাবে, কাজেই অন্যান্য পশু অথবা মানুষ-শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করাও অনেক সহজ হবে। নিজেদের বিপদ এড়াবার জন্য অনেক পশুও দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। ভেড়া, ছাগল, হরিণ এমন কি হাতীও দল বেঁধে বাহির হয়। যখন দলের আর সবগুলি ঘুমায় কয়েকটা জেগে জেগে পাহারা দেয়। দলবদ্ধ নেকড়ে বাঘের অনেক গল্প তুমি নিশ্চয়ই পড়েছ। রুশ দেশে শীতকালে নেকড়ে বাঘগুলির যখন ক্ষুধা পায়—শীতকালেই নাকি এদের ক্ষুধাটা বেড়ে যায়—এরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়, আর মানুষ দেখলেই আক্রমণ করে। একা থাক্‌লে কিন্তু

মানুষকে কখনও বড় একটা আক্রমণ করে না, তবে দলবদ্ধ অবস্থায় এক দল মানুষকে আক্রমণ ক'র্‌তেও এরা ভয় পায় না, মানুষদের তো তখন প্রাণ ভয়ে পালাতে হয়। অনেক সময় তো, শ্লেজ গাড়ীর মধ্যে মানুষ, আর পেছনে নেকড়ে, এদের মধ্যে রীতিমত দৌড়ের পাল্লা লেগে যায়।

দলবদ্ধ হওয়ার শিক্ষাই মানুষের সভ্যতার প্রথম ধাপ। আর এই একেকটা দলকেই বলা যায় জাতি। দলের লোকেরা সবাই মিলে এক সঙ্গে কাজ-কর্ম্ম ক'র্‌ত। এই হ'ল 'পারস্পরিক সাহায্য' অথবা সমবায় প্রথার প্রথম সূত্রপাত। দলের প্রত্যেক লোকেরই প্রথম চিন্তা ক'র্‌তে হ'ত তার দলের কথা, তার পর নিজের কথা। দলের কোন বিপদ উপস্থিত হ'লে দলের সবাইকে যুদ্ধ ক'রে দলটাকে রক্ষা ক'র্‌তে হ'ত। কাউকে যদি দেখা যেত সে দলের কাজে সাহায্য করে না, তবে তাকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ত।

কিন্তু মানুষকে এক সঙ্গে কাজ ক'র্‌তে হ'লেই তার বিধি-বিধান চাই। সবাই যদি যার যার নিজ নিজ মতে চলে, তবে তো দলটা শীঘ্রই ভেঙ্গে যাবে, কাজেই একজন নেতা অথবা দলপতি চাই। দলবদ্ধ পশুর মধ্যেও একটা 'পালের গোদা' থাকে। দলের মধ্যে যে সব চেয়ে বলবান, তাকেই সবাই মিলে দলপতি মেনে নিত। তখনকার দিনে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ কর্‌বার প্রয়োজনটাই ছিল বেশী, কাজেই সব চেয়ে যে বলবান্ তাকেই দলপতি করা হ'ত।

দলের লোকদের নিজেদেরই মধ্যে ঝগরা-ঝাটি হ'লে দলটারই তো লোপ পেয়ে যাবার কথা, কাজেই দলপতিকে দেখ্‌তে হ'ত নিজেদেরই মধ্যে যাতে লড়াই না বাঁধে। অবশ্য একটা দল আরেকটা দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'র্‌ত। সব প্রথমে, মানুষ একাকী সবাই সবাইর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'র্‌ত, আরো পরে যখন সে দলবদ্ধ হ'য়ে যুদ্ধ ক'র্‌তে শিখ্‌ল, সেটাকে নিশ্চয়ই ব'ল্‌তে হ'বে তার এক ধাপ উন্নতি।

প্রথম অবস্থায়, একেকটা দল ছিল একেকটা মস্ত পরিবার, দলের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। এই পরিবারের লোক সংখ্যা যতই বাড়্‌তে লাগ্‌ল, দলটাও ততই বড় হ'তে লাগ্‌ল।

মানুষের সেই আদিম যুগে বিশেষতঃ এ-রকম দল সৃষ্টি হওয়ার আগে তার জীবন-যাত্রা ছিল বড় কষ্টের। তার ঘর-দোর ছিল না, পশুর চামড়া ছাড়া পরণের কাপড় ছিল না, আর যুদ্ধ ছিল তার নিত্যিকার ব্যাপার। প্রত্যহ আহারের জন্য হয় তাকে পশু শীকার ক'র্‌তে হ'ত, নয় তো ফল বাদাম এ-সব সংগ্রহ ক'র্‌তে হ'ত। সে মনে ক'র্‌ত চারদিকেই তার শত্রু। ঝড়, বাদল, শিলা, বৃষ্টি, ভূমিকম্প, এ-সব দেখে প্রকৃতিকেও তার শত্রু ব'লে মনে হ'ত। ছোট্ট একটা ক্ষুদে প্রাণী, সবাইর পদানত হ'য়েই সে পৃথিবীর বুকে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াত, সব কিছু দেখেই সে ভয় পেত, কারণ, সবই ছিল তার বুদ্ধির অগম্য। ঝড় এলে তার মনে হ'ত, মেঘের আড়াল থেকে

কোন দেবতা তাকে আঘাত ক'র্‌চে। মেঘের আড়াল থেকে যে দেবতা তাকে ঝড়, বৃষ্টি আর শিলার আঘাত ক'র্‌চে, ভয় পেয়ে সে চাইত সেই দেবতাকে খুসী ক'র্‌তে। কিন্তু কেমন ক'রে তাকে খুসী করা যায়? বুদ্ধি তো তার সে দিন খুব প্রখর ছিল না, তাই সে ভাব্‌ত, মেঘের দেবতা বুঝি বা তারই মত কেউ,—খুব ভোজনপ্রিয়। ক'র্‌ত কি সে, কতকটা মাংস অথবা একটা শীকার-করা পশু, দেবতার নামে উৎসর্গ ক'রে তার খাবার জন্য একটা জায়গায় রেখে দিত। সে মনে ক'র্‌ত এম্‌নি ক'রেই ঝড় বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

এ-সব আমাদের কাছে আজ মনে হয় বোকামী, কারণ, কেন যে ঝড় বৃষ্টি আর শিলাপাত হয়, তার কারণটা আজ আমরা জানি। একটা পশু বধ ক'রে আর এ-সব বন্ধ করা যায় না। কিন্তু এ-রকম বোকামী কর্‌বার মত অজ্ঞ লোকের অভাব অবশ্য আজ পর্য্যন্তও হয় নাই।

ধর্ম্মের সূচনা ও কর্ম্ম-বিভাগ।

তোমাকে এর আগের চিঠিতে বলেছি, আদিম যুগের মানুষেরা কেমন সব জিনিষকেই ভয় ক'র্‌ত, আর মনে ক'র্‌ত, যত কিছু দুর্ঘটনার হেতু হ'ল দেবতার রাগ ও হিংসা। তারা মনে ক'র্‌ত তাদের সেই মন-গড়া দেবতারা বাস করে পাহাড়, জঙ্গল, নদী আর মেঘের ভিতর, অথবা এম্‌নি সব জায়গায়। তাদের দেবতাকে তারা দয়ালু ভাল-মানুষটী মনে ক'র্‌ত না, ভাব্‌ত দেবতার মেজাজটা বড় রুক্ষ, সব সময় বুঝি বা তার মাথায় রাগ চড়েই আছে। আর এই দেবতার রাগটাই ছিল তার ভয়ের প্রধান কারণ, কাজেই সে চাইত দেবতাকে কিছু খাবার ঘুস দিয়ে তার মেজাজটা ঠাণ্ডা রাখ্‌তে। যখন ভূমিকম্প, বন্যা, অথবা মড়ক, এম্‌নি কোন বিপদ উপস্থিত হ'ত, তারা ভয়ানক ভয় পেয়ে ভাব্‌ত দেবতাদের বুঝি বা রাগ হ'ল, তাই দেবতাদের খুসী ক'র্‌তে তারা অনেক সময় মেয়ে পুরুষ এমন কি নিজেদের সন্তানদেরও দেবতার নামে বলি দিয়ে বস্‌ত। আজ অবশ্য তুমি ভাব্‌চ একি বীভৎস কাণ্ড! কিন্তু ভয় পেয়ে মানুষ কী-ই বা না করে!

ধর্ম্মের সূচনা হ'ল কিন্তু এম্‌নি ভাবেই, ভয় থেকেই মানুষের মনে প্রথম ধর্ম্মের চিন্তা আরম্ভ হ'ল। কিন্তু ভয় পেয়ে যা কিছু করা যায়, তার মধ্যেই মন্দের বীজও লুকানো থাকে। ধর্ম্মের মধ্যে তো জান আমরা কত সুন্দর সুন্দর উপদেশ পাই। তুমি যখন বড় হ'য়ে পৃথিবীর নানা ধর্ম্ম মতের কথা পড়্‌বে, তখন দেখ্‌বে, মানুষ এই এক ধর্ম্মের নামে কত না মহৎ কর্ম্ম, কত না কুকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান ক'রেছে। ধর্ম্মের প্রথম সূচনা কেমন ক'রে হ'ল সেটা এখানে লক্ষ্য করো। পরে অবশ্য দেখ্‌বে আস্তে আস্তে কেমন ক'রে এই ধর্ম্মের পরিণতি হ'ল। মানুষের ধর্ম্ম মতের যত উন্নতিই হউক, আজও কিন্তু মানুষ এই ধর্ম্মের নামে পরস্পর বিরোধ করে, একে অন্যের মাথা ভেঙ্গে ফেলে। আর কেহ কেহ তো এখন পর্য্যন্তও একে ভয়ই করে। সে কথা যাক্।

আদিম মানুষের জীবনটা ছিল বড় কষ্টের। নিত্য তাকে খুঁজে খুঁজে আহার সংগ্রহ ক'র্‌তে হ'ত, নইলে কপালে ছিল তার উপাস। অলস লোকের সে দিনে বেঁচে থাকা ছিল অসম্ভব ; আর এ-ও সম্ভব ছিল না যে কেহ বহু দিনের খাদ্য এক দিনে সংগ্রহ ক'রে তারপর অনেক দিন পর্য্যন্ত কর্ম্মহীন কাটিয়ে দিবে।

কিন্তু, দল-গঠনের সাথে সাথে মানুষের জীবন-যাত্রাও অনেক সহজ হ'য়ে এল। একাকী একজনের পক্ষে মাত্র যে টুকু আহার সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল, দলের সবাই এক সঙ্গে তার চেয়ে

অনেক বেশী আহার সংগ্রহ ক'রতে পারত। এইরূপ সমষ্টিবদ্ধ-ভাবে অথবা পারস্পরিক সাহায্যে আমরা এমন সব কাজ ক'রতে পারি, যা' একলা করা অসম্ভব। দুই একজন লোকের পক্ষে যে ভারী বোঝাটা বহন করা অসম্ভব, সে কাজটাই আবার কয়েক জনের সাহায্যে খুব সহজ হ'য়ে যায়। কৃষির কথা তোমাকে এর আগে বলেছি, এ-ও মানুষের সে দিনের একটা মস্ত আবিষ্কার। তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে, কোন কোন জাতের পিঁপড়ার মধ্যেও কৃষির সূচনা হয়েছে। অবশ্য আমি বলছি না যে ওরা মাটী চাষ করে, বীজ বোনে, তার পর শস্য হ'লে তা' কেটে নেয়। এরা কি করে জান? এরা যদি দেখে, যে সব ছোট গাছের বীজ এরা খায়, তার চারদিকে ঘাস জন্মেছে, তবে সেই ঘাসগুলি ওরা বেশ যত্ন ক'রে তুলে ফেলে। এই ভাবে ওরা ঐ গাছগুলির বাঁচবার সুবিধা ক'রে দেয়।

হয়তো এই পিঁপড়াগুলি আজ যেরকম করে, মানুষও একদিন তাই ক'রত। সেই প্রথম অবস্থায় কৃষি সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। বীজ বপন ক'রে শস্য জন্মাবার মত বুদ্ধি মাথায় আসতে মানুষের অবশ্য বহুদিন কেটে গেল।

কৃষি কাজের প্রারম্ভের সাথে মানুষের খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারটাও অনেক সহজ হ'য়ে গেল। খাদ্যের জন্য দিন রাত শীকার করবার প্রয়োজন ছিল না, কাজেই তার জীবন-যাত্রার দিনগুলিও অনেক সহজ হ'ল। কৃষি কার্য্য আরম্ভ হবার আগে মানুষ ছিল শীকারী। পুরুষদের ঐ এক কাজই ছিল।

স্ত্রীলোকেরা হয়তো ছেলেমেয়েদের দেখা-শুনা ক'র্‌ত আর ফল ইত্যাদি সংগ্রহ ক'র্‌ত। কিন্তু কৃষি কাজের সাথে সাথে নূতন নূতন আরো নানা রকমের কাজেরও সৃষ্টি হ'ল—যেমন মাঠের কাজ, বনে শীকার, গৃহপালিত পশুগুলির দেখা শুনা, ইত্যাদি। খুব সম্ভব, গৃহপালিত পশুগুলির দেখা শুনা, দুধ দোহান—এগুলি ছিল মেয়েদের কাজ। পুরুষদের মধ্যেও হয়তো এক একজন এক একটী কাজ ক'র্‌ত।

পৃথিবীতে আজকাল প্রত্যেক লোকেরই জীবিকা নির্ব্বাহের এক একটি আলাদা ব্যবসা আছে; যেমন ধর, কেহ ডাক্তার—চিকিৎসা করে; কেহ ইঞ্জিনিয়ার—রাস্তা তৈরী করে, পুল তৈরী করে; কেহ ছুতার, কেহ কর্ম্মকার; আবার কেহ বা রাজ-মিস্ত্রি—বাড়ী প্রস্তুত করে; কেহ মুচি, কেহ বা দর্জ্জি, এম্‌নি সব। তবেই দেখ প্রত্যেকেরই এক একটি বিশিষ্ট ব্যবসা আছে, আর অন্য কোনো ব্যবসা সম্বন্ধে তার বিশেষ কোন অভিজ্ঞতাও নেই। একেই আমরা বলি কর্ম্ম-বিভাগ। কেহ যদি একাই অনেকগুলি কাজ শিখ্‌বার চেষ্টা না ক'রে একটি কাজই ভাল ক'রে কর্‌বার চেষ্টা করে, সে সেই কাজটি নিশ্চয়ই সুসম্পন্ন ক'রতে পার্‌বে। পৃথিবীতে এই কর্ম্ম-বিভাগ আজকাল খুব বেশী পরিমাণেই দেখা যায়।

কৃষি কার্য্যের সূচনার সাথে সাথেই এই কর্ম্ম-বিভাগের পদ্ধতিটাও আদিম জাতিগুলির মধ্যে ঢুকেছে।

চৌদ্দ'র চিঠি

সভ্যতার ধাত্রী—কৃষি

আমার আগের চিঠিতে কর্ম্ম-বিভাগের কথা কিছু কিছু বলেছি। একেবারে প্রথম যুগে মানুষ যখন কেবল শীকার ক'রে তার আহার সংগ্রহ ক'র্ত, তখন এই কর্ম্ম-বিভাগের বড় একটা প্রয়োজন ছিল না। প্রত্যেককেই শীকার ক'র্তে হ'ত আর ভর-পেটের খাবার যোগার ক'র্তে যথেষ্ট পরিশ্রমও ক'র্তে হ'ত। এই কর্ম্ম-বিভাগের প্রথম সূচনা হয়েছিল পুরুষ আর স্ত্রীলোকের মধ্যে—পুরুষেরা বাইরে শীকার ক'র্ত, মেয়েরা বাড়ীতে থেকে ছেলে-মেয়ে আর গৃহপালিত পশুগুলির দেখা-শুনা ক'র্ত।

কৃষির সূচনার সাথে সাথেই মানুষেরও নানা দিকে নানা রকমের নূতন নূতন উন্নতি হ'তে লাগল। আর তখন থেকেই একটু ব্যাপক ভাবে কর্ম্ম-বিভাগও আরম্ভ হ'ল। কেউ শীকার ক'র্ত, আবার কেউ বা মাঠের কাজ ক'র্ত, মাটী চাষ ক'র্ত। তারপর যতই দিন যেতে লাগল মানুষও নানা রকমের নূতন শিল্প শিখে তাতে বিশেষজ্ঞ হ'তে লাগ্ল।

এই কৃষির উদ্ভাবনের একটা প্রধান ফল এই হ'ল যে, মানুষেরা গ্রাম এবং সহরে বসবাস আরম্ভ ক'র্ল। কৃষি কাজ

আরম্ভ হ'বার আগ পর্য্যন্ত মানুষ নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াত, আর শীকার ক'রে জীবনধারণ ক'র্‌ত। একই স্থানে বসে থাক্‌বার তাদের কোন প্রয়োজনই ছিল না, যেখানেই যেত, সেখানেই তাদের শীকার মিল্‌ত। তারপর এ রকম ভাবে ঘুরে বেড়াবার আরেকটা কারণও ছিল। তাদের সঙ্গের গরু, ভেড়া ও অন্যান্য পশুদেরও তো চরবার ভূমির দরকার; অনেক দিন এক জায়গায় থাক্‌লে পশুগুলির ঘাসের অভাব হ'ত, কাজেই সমস্ত দলটীকে আরেক জায়গায় সরে যেতে হ'ত।

কিন্তু মানুষ যখন মাঠ চ'ষে কৃষি কাজ আরম্ভ ক'র্‌ল, তখন সেই চাষ-করা জমির নিকটে থাকা তাদের প্রয়োজন হ'য়ে দাঁড়াল। জমি চাষ ক'রে, বীজ বুনে, সেই জমি ফেলে দূরে সরে যাওয়া আর কিছু চলে না। কাজেই শস্য-বপনের সময় থেকে শস্য কাটা পর্য্যন্ত তাদের এক জায়গায়ই সুস্থির হ'য়ে থাক্‌তে হ'ত, আর এ রকম ক'রেই আস্তে আস্তে সহর, গ্রাম সব গ'ড়ে উঠ্‌ল।

কৃষির দ্বারা মানুষের আরেকটী প্রধান উপকার এই হ'ল যে, তার জীবন-যাত্রার দিনগুলি অনেক সহজ হ'ল। সারাদিন ধ'রে কেবল শীকার করবার চেয়ে জমি চাষ ক'রে শস্য উৎপাদন করা অনেক সহজ। জমিতে যে শস্য জন্মাত, তা তো আর একবারে খেয়ে শেষ করা যেত না, কাজেই যেটা বেশী হ'ত তা সঞ্চয় ক'রে রাখা হ'ত।

এবার মানুষের উন্নতির পরের ধাপটা দেখা যাক্। যখন

শীকারই ছিল মানুষের একমাত্র জীবিকা, তখন তার পক্ষে এক রকম কিছুই সঞ্চয় করা সম্ভব ছিল না, যদিই বা সে কিছু সঞ্চয় ক'র্‌ত, তা অতি সামান্য। সে দিন তার জীবন-যাপনের পদ্ধতিটা ছিল কোন রকমে 'এনে-নিয়ে-খেয়ে' থাকা। ধন সম্পত্তি তো তার আর কিছু ছিল না, আর তা জমা রাখ্‌বার কোন ব্যাঙ্কও নিশ্চয়ই ছিল না। নিত্যিকার আহার তাকে শীকার ক'রে সংগ্রহ ক'র্‌তে হ'ত। কিন্তু যখন সে মাটী চাষ ক'রে শস্য জন্মাতে আরম্ভ কর্‌ল, তখন অবশ্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রচুর খাদ্যই সে পেত। এই অতিরিক্ত খাদ্য অথবা শস্য সে সঞ্চয় ক'রে রাখ্‌ত, এই থেকেই আরম্ভ হ'ল খাদ্যের অতিরিক্ততা। একটু বেশী পরিশ্রম সে ক'র্‌তই কাজেই ঘরেও তার কিছু শস্যের সঞ্চয় হ'ত।

আজকাল অনেক ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হ'য়েছে। লোকেরা সেখানে তা'দের টাকা জমা রাখে, আর প্রয়োজন মত চেক কেটে জমা টাকা উঠিয়ে নেয়। কিন্তু ব্যাঙ্কে এসে এই টাকা জমা হয় কেন ? একটু ভাবলেই বুঝবে, এই টাকাটা হ'য়েচে প্রয়োজনের অতিরিক্ত, অর্থাৎ ঐ টাকার মালিক একবারেই সমস্ত টাকাটা খরচ ক'রে ফেল্‌তে চায় না, কাজেই ব্যাঙ্কে জমা রাখে। যে ধনী তার হাতে র'য়েছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যথেষ্ট টাকা, আর যে দরিদ্র তার নেই কিছুই। এর পরে দেখ্‌বে এই অতিরিক্ত টাকার উৎপাদন হয় কেমন ক'রে ? একজন আরেক জনের চেয়ে বেশী খাট্‌লেই যে অতিরিক্ত ধনের অধিকারী

হবে এমন হয় না, বরং আজ কালের দিনে যে মোটেই খাটে না তার হাতেই এসে অতিরিক্ত টাকা জমা হয়, আর যে উপার্জ্জনের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেল্‌চে, তার কপালে জোটে না কিছুই। এটাকে খুব অন্যায় বিধান মনে হচ্ছে না? অনেকেরই ধারণা, এই অন্যায় বিধির জোরেই পৃথিবীতে দরিদ্রের সংখ্যা বেড়ে গেচে এত। এ-কথাগুলি বুঝতে হয়তো তোমার একটু কষ্ট হচ্ছে। কঠিন মনে হ'লে এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না, আরেকটু বড় হ'লেই এ-সব কথা বুঝ্‌বে।

এখনকার মত এই কথাটাই মনে রেখ, কৃষির ফলে, একবারে যা খেয়ে শেষ করা যায়, তার চেয়ে শস্যের ফলন হ'ত অনেক বেশী। এই বেশীটুকুই সঞ্চয় করা হ'ত। সেই দিনে অর্থও ছিল না, ব্যাঙ্কও ছিল না। যার অনেক গরু, ভেড়া, উট অথবা শস্য ছিল, তাকেই বলা হ'ত ধনী।

পনেরোর চিঠি

দলপতির গল্প

আমার ভয় হচ্ছে চিঠিগুলি যেন তোমার পক্ষে ক্রমেই একটু কঠিন হ'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের চারদিকের জীবন-যাত্রাও তো কম জটিল নয়। আদিম যুগে মানুষের জীবন যাত্রা অনেক সহজ সরল ছিল। এখন আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা কর্‌ছি, তখন থেকেই মানুষের জীবনে জটিলতা আরম্ভ হ'য়েছে। তোমাকে এখন আস্তে আস্তে অগ্রসর হ'তে হবে, প্রত্যেক ধাপে মানুষের জীবনে এবং সমাজে যে পরিবর্ত্তনটী এসেছে, তাই তোমাকে বুঝতে হবে, তবেই বর্ত্তমানের অনেক কথা তোমার পক্ষে বুঝা সহজ হবে। এ রকম ধীরে ধীরে বুঝতে চেষ্টা না কর্‌লে, আমাদের চারদিকে আজ যে সব ঘটনা ঘট্‌চে, তার কিছুই তুমি বুঝতে পার্‌বে না। মনে হবে যেন বনের আঁধারে ছোট শিশুর মত পথ হারিয়ে ফেলেচ। তাই আমি তোমাকে একেবারে বনের এক প্রান্ত সীমায় নিয়ে এসেছি, যেন তুমি পথ খুঁজে পাও।

তোমার হয়তো মনে আছে, মুসৌরীতে তুমি একদিন আমাকে রাজাদের কথা জিজ্ঞেস ক'রে জান্‌তে চেয়েছিলে,

তারা কি, আর রাজাই বা হ'ল কেমন ক'রে? এই রাজাদের সৃষ্টি হ'য়েছে বহু দিন আগে, সেই প্রাচীন যুগের দিকে এখন আমরা একবার উঁকি মেরে দেখ্‌ব। প্রথমই অবশ্য মানুষ রাজা ব'লে কাউকে অভিহিত করে নাই। সেই যুগের বিষয় এখন একটু শোন, তবেই রাজাদের উৎপত্তির ইতিহাসটাও বুঝ্‌তে পার্‌বে।

ছোট ছোট দল যে কেমন ক'রে গ'ড়ে উঠ্‌ল, তা তোমাকে আগেই বলেছি। যখন থেকে কৃষির সূচনা হ'ল, তখন থেকেই কর্ম্ম-বিভাগেরও সূত্রপাত হ'ল। কাজেই কাজ কর্ম্মের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য, দলের মধ্যে একজন লোক বিশেষের প্রয়োজন হ'ল। এর আগেও কিন্তু দুই দলে যখন যুদ্ধ বাঁধ্‌ত, তখন দলের লোকেরা, যুদ্ধে নেতৃত্ব করবার জন্য একজন ক'রে নেতা ঠিক ক'রে নিত। দলের সব চেয়ে বৃদ্ধ ব্যক্তিই ছিল দলের নেতা। তাকে বলা হ'ত, অর্থাৎ আমরা এখন তার নাম দিয়েছি দলপতি (Patriarch)। সব চেয়ে যে বৃদ্ধ তাকেই সবাই মনে ক'র্‌ত সব চেয়ে জ্ঞানী আর অভিজ্ঞ। এই দলপতি কিন্তু প্রথম অবস্থায় দলের অন্যদের চেয়ে বিশিষ্ট কেউ ছিল না। সে-ও দলের আর সবাইর সাথে এক সঙ্গে কাজ কর্ম্ম ক'র্‌ত এবং যে খাদ্য উৎপন্ন হ'ত তা-ও সবাইর মধ্যেই সমান ভাবে ভাগ করা হ'ত। যাবতীয় জিনিষের অধিকারী ছিল কিন্তু সমবেত ভাবে ঐ দলটা। আজকাল যেমন সকলেরই যার যার নিজ নিজ বাড়ী ঘর, ধন,-সম্পত্তি এবং আরও সব নানা জিনিষ রয়েছে, সে যুগে কিন্তু তেমন ছিল না। দলের যে কেউ যা কিছু অর্জ্জন ক'রত,

তারই ভাগ হ'ত, কারণ সমস্তই ছিল দলের অধিকারে। এই ভাগ করার কাজটাই দলপতি ক'রে দিত।

তারপর, ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন সুরু হ'ল। কৃষি কাজের সাথে সাথে মানুষের আরও নূতন নূতন কাজও জুটে গেল। দলপতির তখন বেশীর ভাগ সময়ই কেটে যেত ঐ সব কাজ কর্ম্মের শৃঙ্খলা বিধানে, আর দলের সবাই নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কাজ ক'র্‌চে কিনা, তারই দেখা শুনা ক'র্‌তে। তাই দলপতি ক্রমে ক্রমে সাধারণ কাজ কর্ম্ম অর্থাৎ অন্যান্যদের মত পরিশ্রম করা একেবারেই ছেড়ে দিল। এমনি ক'রেই ঐ দলপতি শেষ পর্য্যন্ত দলের অন্যান্যদের চেয়ে নিজে একটি বিশিষ্ট ব্যক্তি হ'য়ে দাঁড়াল। কর্ম্ম বিভাগের আরেকটি নূতন ধারায় এসে আমরা এখন পৌছুলাম। দলপতির কাজ হ'ল এখন কাজ কর্ম্মের শৃঙ্খলা সম্পাদন করা, আর দলের লোকদের আদেশ দেওয়া। আর দলের লোকদের কাজ হ'ল,—কৃষি কার্য্য করা, শীকার করা, যুদ্ধে যাওয়া এবং দলপতির আদেশ পালন করা। যুদ্ধের সময় দলপতির ক্ষমতা ছিল আরও বেশী, কারণ সেনাপতি ছাড়া তো আর ভাল ক'রে যুদ্ধ করা যায় না। এমনি ক'রেই দলপতি আস্তে আস্তে খুব ক্ষমতাশালী হ'য়ে উঠ্‌ল।

দলের শৃঙ্খলা বিধানের কাজ ক্রমেই বেড়ে গেল, দলপতিরও আর একাকী সকল কাজ করা সম্ভব ছিল না, কাজেই সহকারী হিসাবে তিনি দল থেকে আরও কয়েক জনকে বেছে নিলেন। এই সহকারীর সংখ্যাও কিন্তু ক্রমে ক্রমে বেড়ে গেল। এবার দেখ,

দলের মধ্যে দু'টী শ্রেণীর উদ্ভব হ'ল,—পরিচালক আর সাধারণ কর্ম্মী। মানুষের সাম্য ভেঙ্গে গেল, প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণীর উপর ক্ষমতাশালী হ'য়ে উঠ্‌ল।

দলপতির ক্ষমতা যে ক্রমে ক্রমে কেমন ক'রে বেড়ে গেল, তাই তোমাকে পরের চিঠিতে লিখ্‌ব।

দলপতির আরো গল্প।

সেই বহু যুগ আগের দল আর দলপতির গল্পটা হয়তো তোমার নেহাৎ মন্দ লাগ্‌চে না।

তোমাকে আগের চিঠিতে লিখেছি, প্রথম অবস্থায় সমগ্র দলটাই ছিল সমবেত ভাবে সমস্ত সম্পত্তির মালিক। দলের কারুরই নিজস্ব সম্পত্তি বলে কোন জিনিষ ছিল না, এমন কি দলপতিরও নয়। দলেরই একজন হিসাবে সে-ও একজন অংশীদার ছিল এই মাত্র। কিন্তু সে-ই ছিল দলের কর্ত্তা, কাজেই বিষয় সম্পত্তির দেখা শুনাও তাকেই ক'র্‌তে হ'ত। তারপর আস্তে আস্তে তার ক্ষমতা যতই বাড়্‌তে লাগ্‌ল, সে-ও মনে ক'র্‌তে আরম্ভ ক'র্‌ল সে নিজেই সমস্ত সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিক, দলের সবাইকে আর অংশীদার ব'লে মান্‌তে সে রাজী হ'ল না। অথবা এ-ও হ'তে পারে দলপতি হিসাবে সে নিজেকেই মনে ক'র্‌ত সবাইর প্রতিনিধি। এই ভাবেই মানুষ নিজকে সম্পত্তির মালিক ব'লে প্রথম ভাব্‌তে শিখল। 'তোমার', 'আমার' এই ব'লে আজকাল আমরা সব জিনিষের নির্দ্দেশ করি। কিন্তু তোমাকে তো বলেছি দল সৃষ্টির প্রথম যুগে কেহই এই কথা ভাব্‌ত না। সেই দিনে দল-ই ছিল সমস্ত জিনিষের মালিক। বৃদ্ধ দলপতির হয়তো এই কথাই একদিন মনে হ'ল তার নামেই তো দলের পরিচয়, কাজেই সমস্ত বিষয় সম্পত্তির মালিকও তিনিই স্বয়ং।

বৃদ্ধ দলপতি ম'রে যাওয়ার পর দলের সবাই মিলে আরেকজনকে দলপতি ব'লে মেনে নিল। কিন্তু দলপতির পরিবারের লোকদেরই দল পরিচালনার বিষয় সব ভাল জানা ছিল। দলপতির সাথে তারাই সর্ব্বক্ষণ থাক্‌ত, আর তার কাজ কর্ম্মেও তাকে সাহায্য ক'র্‌ত, কাজেই এই বিষয়ে অন্যদের চেয়ে তাদেরই বেশী অভিজ্ঞতা ছিল। তাই, কোন দলপতির মৃত্যু হ'লে দলের লোকেরা তখন তা'র পরিবারেরই কাউকে দলপতি ব'লে মেনে নিত। কাজেই দেখ, দলপতির নিজ পরিবারের লোকেরা অন্যান্যদের চেয়ে একটু বিশিষ্ট হ'য়ে দাঁড়াল। তারপর আরেকটা কথা, দলপতির নিজেরও যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল, কাজেই সে চাইত তার মৃত্যুর পর যেন তার ছেলে অথবা ভাই তার স্থান অধিকার করে। এ রকমটা ঘটাবার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টাও ক'র্‌ত। সে তার ছেলে অথবা ভাই অথবা অন্য কোন নিকট আত্মীয়কেই এই কাজে বিশেষ ভাবে শিক্ষিত ক'রে যেত, যেন তার অবর্ত্তমানে সে-ই তার স্থান অধিকার ক'রে নিতে পারে। সে হয়তো দলের মধ্যে এ কথাও প্রকাশ ক'র্‌ত যে, সে যাকে পছন্দ ক'রে শিক্ষিত ক'রে গেল, তার মৃত্যুর পর তাকেই নির্ব্বাচন ক'র্‌তে হবে। প্রথম প্রথম দলের লোকেরা নিশ্চয়ই এ রকম আদেশ পছন্দ ক'র্‌ত না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই আদেশ পালনে তারা অভ্যস্ত হ'য়ে গেল, আর শেষ পর্য্যন্ত দলপতির আদেশ পালনে তাদের কোন দ্বিধা বোধও হ'ত না। কাজেই দলপতি মনোনয়নের ব্যবস্থাটা ক্রমে

উঠেই গেল, কারণ বুড়া দলপতির মৃত্যুর পর কে যে দলপতি হবে, তা তো আগেই স্থির হ'য়ে আছে।

এম্‌নি করেই এই দলপতিত্ব আস্তে আস্তে বংশানুক্রমিক হ'য়ে দাঁড়াল অর্থাৎ পিতার মৃত্যুর পর পুত্র অথবা অন্য কোন নিকট আত্মীয়ের হাতেই এই অধিকারটী যেত। দলপতি মহাশয় এবার ঠিক ঠিকই ভেবে নিলেন দলের বিষয় সম্পত্তির মালিকও তিনিই স্বয়ং, কাজেই তার মৃত্যুর পরও সম্পত্তিটা তার পরিবারের লোকদের অধিকারেই থেকে যেত। এমনি করেই মানুষের মনে 'আমার জিনিষ' 'তোমার জিনিষ' এই ভাবটী গ'ড়ে উঠ্‌ল। প্রথম অবস্থায় কিন্তু মানুষের এই জ্ঞান ছিল না; দলের সবাই একযোগে উপার্জ্জন ক'র্‌ত দলের জন্য, কারুর একার জন্য তো নয়। তাদের সবাইর সমবেত চেষ্টায় যে ফসল বা দ্রব্যাদি উৎপন্ন হ'ত তা'ই সবাইর মধ্যে ভাগ করা হ'ত। দলের মধ্যে ধনী দরিদ্র ব'লে কোন কথা ছিল না। দলের সম্পত্তির সকলেই ছিল একেক জন অংশীদার।

কিন্তু যখন থেকে দলের সম্পত্তির উপর দলপতির হস্তক্ষেপ আরম্ভ হ'ল, তখন থেকেই ধনী দরিদ্রেরও সৃষ্টি হ'ল।

আমার পরের চিঠিতে এই বিষয় আরও বল্‌ব।

দলপতির রাজ্যাভিষেক।

ঐ বুড়ো দলপতির গল্প নিয়ে কিন্তু অনেক সময় কাটিয়ে দিয়েছি। শীগ্‌গীরই তার কথা শেষ করব ; আচ্ছা, বরং তার নামটাই এবার বদলে দিচ্ছি। রাজাদের সৃষ্টি হ'ল কেমন ক'রে, আর তারা কি, এ সব কথা বল্‌ব ব'লেই দলপতির গল্প আরম্ভ করেছিলাম। রাজাদের কথা জান্‌তে হ'লে, সেই পুরাণো যুগের দলপতিদের কথাই আগে বুঝ্‌তে হবে। তুমি হয়তো এতক্ষণে কতকটা আঁচ ক'রে নিয়েচ, এই দলপতিই শেষ পর্য্যন্ত রাজা, মহারাজা হ'য়ে দাঁড়াল। Patriarch শব্দটা ল্যাটীন ভাষার pater (ইংরেজী father) শব্দ থেকে এসেচে। এই Patriarchই ছিলেন তার দলের দলপতি অর্থাৎ তিনিই ছিলেন যেন তার দলের লোকদের পিতা। Patria অর্থ পিতৃভূমি, এই শব্দটাও ঐ ল্যাটীন "Pater" শব্দ থেকে এসেচে। তুমি তো জানই ফরাসী ভাষায় এই শব্দটাই হ'ল "Patrie", সংস্কৃত এবং হিন্দি ভাষায় কিন্তু আমরা বলি মাতৃভূমি, কারণ দেশকে আমরা মা'র মতই দেখি। তোমার কোন্‌টা ভাল লাগে বল তো ?

এই দলপতিত্ব যখন পিতার পরে পুত্রের হাতে যেতে আরম্ভ ক'র্‌ল, অর্থাৎ যখন বংশানুক্রমিক হ'য়ে দাঁড়াল, তখন রাজা আর দলপতির মধ্যে কিন্তু কোন তফাৎই রইল না। এই দলপতিই আস্তে আস্তে রাজায় পরিণত হ'ল। রাজা হ'য়ে তার মনে এই অদ্ভুত ধারণা জন্মিল যে, দেশের যত কিছু সবের মালিকই তিনি। তিনি মনে ক'র্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন, দেশ বল্‌তে তাকেই বুঝায়। একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী রাজা এক সময় বলেছিলেন—"L'etat c'est moi", "The State it is I." অর্থাৎ রাজ্য মানেই আমি। রাজা ভুলে গেলেন যে, তিনি প্রজাদের দ্বারাই মনোনীত হয়েছিলেন। প্রজারা তাকে মনোনীত ক'রেছিল, কাজ কর্ম্মের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য, আর খাদ্যাদি তা'দের মধ্যে বণ্টন করে দেবার জন্য। তিনি এ-ও ভুলে গেলেন যে দলের মধ্যে অথবা দেশের মধ্যে তাকে সব চেয়ে অভিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান মনে করেই জনসাধারণ তাকে মনোনীত করেছে। রাজাদের মনে হ'ল তারা প্রভু, আর দেশের সব লোক তাদের ভৃত্য। আসলে কিন্তু তারাও দেশ আর দেশের লোকদের সেবক ছাড়া আর কিছুই নয়।

এর পরে যখন ইতিহাসের বই প'ড়্‌বে, তখন দেখ্‌বে রাজারা শেষ পর্য্যন্ত এতই স্বার্থপর হ'য়ে দাঁড়াল যে, তারা মনে ক'র্‌তে আরম্ভ ক'র্‌ল যে দেশের লোকের রাজা মনোনয়নের কোন অধিকার নাই। তা'রা বল্‌ত যে ভগবানই তাদের রাজা ক'রে সৃষ্টি করেচেন, রাজা হওয়া ভগবানদত্ত অধিকার। বহুকাল

যাবৎ এই রাজার দল বহু অনাচার ক'রে এসেচে। প্রজারা না খেয়ে মরেচে, সেদিকে তাদের দৃষ্টি ছিল না, নিজেরা বিলাস ঐশ্বর্য্যে কাটিয়েছে। কিন্তু এরকম অত্যাচার আর লোকে কতকাল সহ্য কর্‌বে? কোন কোন দেশের প্রজারা ত্যক্ত হ'য়ে রাজাদের তাড়িয়ে দিল। ইংলণ্ডের লোকদের রাজা প্রথম চার্লসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, রাজার পরাজয়, তা'র হত্যা; প্রসিদ্ধ ফরাসী বিদ্রোহের কথা; এসব তুমি আরেকটু বড় হ'য়ে পড়্‌বে। ফরাসীরা তো ঠিক ক'র্‌ল তাদের দেশে তারা আর রাজা রাখবে না। তোমার হয় তো মনে আছে, প্যারীতে আমরা Conciergerie জেলখানা দেখ্‌তে গিয়েছিলেম। তুমি ছিলে তো আমাদের সাথে? রাণী Marie Antoinette এবং রাজ পরিবারের অন্যান্যদের এই জেল খানায় বন্ধ ক'রে রাখা হ'য়েছিল। এই তো কয়েক বছর আগের প্রসিদ্ধ রুস বিদ্রোহের কথা, তার ইতিহাসও তুমি প'ড়্‌বে। রাশিয়ার লোকেরা তো তাদের রাজা জারের বংশ লোপ করেই দিয়েচে।

রাজাদের আর এখন সেই দিন নেই। এখন অনেক দেশেই রাজা নেই। ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, রাশিয়া, সুইটজারল্যাণ্ড, আমেরিকা, চীন এবং আরও অনেক দেশে রাজা নেই। এগুলি সব প্রজাতান্ত্রিক দেশ অর্থাৎ কয়েক বৎসর পর পর দেশের জনসাধারণ নিজেদের শাসনকর্ত্তা অথবা নেতা নির্ব্বাচন করে। এই শাসনকর্ত্তার চাকুরিটি বংশানুক্রমিক নয়।

ইংলণ্ডে অবশ্য এখনও রাজা আছে, কিন্তু রাজা হিসাবে তার নিজের হাতে ক্ষমতা খুব অল্পই আছে। সমস্ত ক্ষমতা পার্লামেণ্টের হাতে। পার্লামেণ্টের সমস্ত সভ্যই জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন। লণ্ডনের পার্লামেণ্ট যে দেখেছিলে তোমার মনে আছে তো ?

ভারতবর্ষে কিন্তু এখনও অনেক রাজা, মহারাজা, নবাব রয়েছেন। তাদের দেখবে দামী মোটর হাকিয়ে, সৌখীন জামা কাপড় প'রে চলা-ফেরা করেন। নিজেদের বাবুগিরির জন্য খরচের আর অন্ত নাই। এই বাবুগিরি কর্‌বার টাকা এরা কোথায় পায় জান ? প্রজাদের কাছ থেকে খাজান' আদায় করা হয়। কিন্তু রাজাকে তো খাজানা দেওয়া হয়, যেন দেশের সর্ব্বসাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানে সেই টাকা খরচ করা হয়। ইস্কুল করা, হাসপাতাল করা, লাইব্রেরী মিউসিয়াম করা, ভাল ভাল রাস্তা তৈরী করা—এই সব হিতকর অনুষ্ঠানের কথাই আমি বল্‌চি। কিন্তু আমাদের দেশের রাজা মহারাজার দল আজও সেই ফরাসী দেশের রাজার মতই মনে করেন,—L' etat c'estmoi, The state it is I—রাজ্য মানেই তো আমি। প্রজাদের অর্থ তারা নিজেদের আঁমোদ-প্রমোদে খরচ করে। রাজারা আছে সব বিলাসিতায় ডুবে, আর রাজ্যের প্রজারা, যারা তাদের এই অর্থ যোগায়, তারা মরে উপাস ক'রে অর্থাভাবে, আর তাদের ছেলেরা থাকে মূর্খ হ'য়ে ইস্কুলের অভাবে।

প্রাচীন সভ্যতা।

দলপতি আর রাজাদের কথা মোটামুটী যথেষ্ট বলা হ'ল। এবার পেছন ফিরে আরেকবার তাকান যাক এবং প্রাচীন সভ্যতা, আর সে দিনের লোকদের কথাই কিছু আলোচনা করা যাক্।

সেই প্রাচীন সভ্য লোকদের কথা অবশ্য আমরা খুব বেশী কিছু জানি না, কিন্তু তবু আদি ও নব প্রস্তর-যুগের (Palaeolithic and Neolithic) মানুষদের চেয়ে অনেক বেশী জানি। হাজার হাজার বছর আগের পুরাণো মস্ত মস্ত দালান কোঠার ভগ্নাবশেষ আজ পর্য্যন্তও পাওয়া যায়। এই পুরাণো মন্দির প্রাসাদগুলির দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে আমরা সেই যুগের মানুষ আর তাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কতকটা ধারণা ক'র্‌তে পারব। ঐ সব দালানের গায়ের খোদিত কারুকার্য্য আর পাষাণ মূর্ত্তিগুলির মধ্যে সেই যুগের অনেক নিদর্শনই র'য়ে গেছে। ঐ মূর্ত্তিগুলি থেকেই আমরা সেই দিনের মানুষদের পোষাক-পরিচ্ছদ এবং আরো নানা বিষয়ের পরিচয় পাই।

একেবারে প্রথম, মানুষ যে কোথায় ঘর-দোর বেঁধে বসবাস আরম্ভ করেছিল, আর কোন্ দেশে যে মানবের আদিম-সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছিল তা ঠিক ক'রে বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন আটলান্টিক সাগরের মধ্যে আটলান্টিস্ নামে একটা মস্ত বড় দেশ ছিল। সেই দেশের লোকেরা নাকি খুব সভ্য ছিল। কিন্তু দেশটার কোন চিহ্নই অবশ্য আজ আর নেই, সমস্ত দেশটাই আটলান্টিকের ক্ষুধা নিবৃত্তি করেছে। এই দেশটা সম্বন্ধে অবশ্য কতকগুলি প্রচলিত গল্প ছাড়া আর কোন প্রমাণই নেই। কাজেই এর কথা আমরা ছেড়েই দিব।

কারো কারো মতে আবার প্রাচীনকালে আমেরিকাতেও কতকগুলি সুসভ্য জাতির বাস ছিল। তুমি জান, কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন ব'লে একটা প্রচলিত কথা আছে। এ কথার অর্থ এ নয় যে কলম্বাসের আগে আমেরিকার অস্তিত্ব ছিল না। আসলে, ইউরোপের লোকেরা কলম্বাসের আগে ঐ দেশটার কথা জান্‌ত না। কলম্বাসের যাবারও বহু পূর্ব্বে সেই দেশে মানুষের বাস ছিল, এবং তাদেরও একটা সভ্যতা ছিল।

উত্তর আমেরিকার ম্যাক্সিকো প্রদেশের ইয়ুকাটান (Yukatan) এবং দক্ষিণ আমেরিকার পেরু সহরে কতকগুলি পুরাণো দালান-কোঠার ভগ্নাবশেষের চিহ্ন পাওয়া গেছে। কাজেই আমরা নিঃসন্দেহে বল্‌তে পারি, অতি প্রাচীন কালে ইয়ুকাটান এবং পেরুতে খুব সভ্য লোকদের বাস ছিল।

কিন্তু ওদের কথা খুব বেশী কিছু বলা সম্ভব নয়, কারণ তাদের বিষয় বিস্তারিত এখনও কিছুই জানা যায় নাই। হয়তো ভবিষ্যতে এদের বিষয় আরো অনেক জানা যাবে।

ইউরোপ ও এশিয়াকে একত্রে বলা হয় ইউরেশিয়া। ইউরেশিয়ায় প্রাচীনতম সভ্যতার আবির্ভাব হ'য়েছিল, মেসোপোটামিয়া, মিশর, ক্রীট, ভারতবর্ষ এবং চীনদেশে। মিশরকে অবশ্য এখন আফ্রিকার মধ্যে ধরা হয়, কিন্তু খুব কাছাকাছি ব'লে আমরা একে ইউরেশিয়ার মধ্যেই ধ'রেছি।

সেই প্রাচীন যাযাবর জাতিগুলি যখন ঘর-দোর বেঁধে বসবাস আরম্ভ ক'র্‌ল, কি রকম দেশ তারা বেছে নিল বল তো? যেই সব স্থানে তাদের আহার খুব সহজ প্রাপ্য ছিল, সেই সব স্থানই অবশ্য তাদের পছন্দ হ'ল। তাদের খাদ্যের কতকটা অংশ ছিল কৃষিজাত। আবার কৃষির জন্য জলের প্রয়োজন খুব বেশী। জলের অভাবে সব মাঠ শুকিয়ে যায়, মাঠেও আর কোন শস্য জন্মে না। কৃষির জন্য জলের যে কত প্রয়োজন তা তো এই থেকেই বুঝতে পার যে, মৌসুমের সময় ভারতবর্ষে যথেষ্ট বৃষ্টি না হ'লে, ভাল ফসল জন্মে না, দেশেও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অন্নাভাবে দারিদ্রেরা উপাস ক'রে মরে। কাজেই তুমি বলবে, প্রাচীন যুগের মানুষেরা বসবাসের নিমিত্ত নদীমাতৃক দেশগুলিকেই পছন্দ ক'রেছিল।

—হাঁ ঠিক বলেছ।

মেসোপোটামিয়ায় টাইগ্রীস্ ও ইয়ুফ্রেটিস্ নদীর মাঝের ভূখণ্ডে, আর মিশরে মহানদী নাইলের তীরে তা'রা তা'দের বাসা বেঁধেছিল। ভারতবর্ষেও বেশীর ভাগ সহরই গ'ড়ে উঠেছিল, সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা এ-সব বড় বড় নদীর তীরে। জল তাদের এত প্রয়োজনীয় ছিল যে, তারা তাদের অন্নদাতা, ঋদ্ধিদাতা নদীগুলিকে বড়ই পবিত্র মনে ক'র্‌ত। মিশরীরা নাইলকে 'পিতা নাইল' ব'লে পূজা ক'র্‌ত। ভারতবর্ষেও গঙ্গা নদীকে পূজা করা হ'ত, আর এখনও একে খুব পবিত্র মনে করা হয়। একে বলা হয় 'গঙ্গা মাঈ'। তীর্থযাত্রীরা যে 'গঙ্গা মাঈ কী জয়' ধ্বনি করে তা তো তুমি শুনেছ। কেন যে ওরা নদীকে পূজা ক'র্‌ত তা বুঝা কঠিন নয়—নদী যে তাদের বড় হিতকারী ছিল। জল ছাড়াও আরো একটী জিনিষ—পলিমাটী —এই নদীর কাছ থেকেই পাওয়া যায়। এই পলিমাটীই ফসল ক্ষেতগুলিকে উর্ব্বর করে। নদীর জল, আর এই পলিমাটীর গুণেই ক্ষেত্রগুলি প্রচুর শস্য উৎপাদন করে। কাজেই নদীগুলিকে 'পিতা' 'মাতা' বলা কিছুই অন্যায় নয়। কিন্তু কার্য্য-কারণ সম্বন্ধটা ভুলে যাওয়া মানুষের একটা অভ্যাস, একটুকুও না ভেবেই তারা পূর্ব্বপুরুষের অনুকরণ ক'রে যায়। এ কথা মনে রেখ নাইল ও গঙ্গা মানুষকে অন্ন জল দিত ব'লেই তাদের পবিত্র মনে করা হ'ত।

প্রাচীন যুগের কয়েকটী প্রসিদ্ধ নগর।

আমরা জানি মানুষেরা প্রথম তাদের বসবাস স্থরু ক'রেছিল বড় বড় নদী আর উর্ব্বর উপত্যকার ধারে, কারণ, সেই সব স্থানেই অন্ন জলের প্রাচুর্য্য ছিল। বড় বড় নগরগুলি ছিল সবই নদীর তীরে। তুমি হয়তো খুব প্রাচীন কতকগুলি নগরের নাম শুনেছ। মেসোপোটামিয়ায় এ রকম কতকগুলি নগর ছিল—বেবিলোন, নিনেভা, আস্থর। কিন্তু এ-সব সহরগুলি যে লোপ পেয়ে গেছে, সেও আজ বহু দিনের কথা ; তবে এদের ভগ্নাবশেষ বহু দূর নীচে বালু আর মাটী খুঁড়লে আজও পাওয়া যায়। সহস্র সহস্র বছরের ফলে ঐ নগরগুলি একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে বালু আর মাটীর নীচে ঢাকা প'ড়ে গেছে। কোন কোন স্থানে আবার ঐ ঢেকে-যাওয়া নগরগুলির মাথার উপরই নূতন আরেকটা সহর গ'ড়ে উঠেছিল। এই সব প্রাচীন নগরের সন্ধানী যারা, তারা অনেক দূর পর্য্যন্ত মাটী খুঁড়ে দেখেচেন পর পর একটার মাথায় আরেকটা, এ রকম ভাবে অনেকগুলি সহর গ'ড়ে উঠেচে। অবশ্য একই সময়ে মাথায় মাথায় চ'ড়ে কতকগুলি সহর এক সঙ্গে গ'ড়ে উঠে নাই। বহু শত বছর ধ'রে হয়তো একটা সহরের অস্তিত্ব ছিল, যে সব মানুষ প্রথম

সেখানে বাস ক'র্‌ত তারা ম'রে গেল, তাদের ছেলে, ছেলেদের ছেলে তারাও তাদের জন্ম-মৃত্যুর খেলা ওখানেই শেষ ক'র্‌ল। তারপর হয়তো কোনো কারণ বশতঃ ক্রমে ক্রমে বহু লোক ঐ সহর ছেড়ে চ'লে গেল। সহরটা শেষে একদিন একেবারেই জন-প্রাণী শূন্য হ'য়ে গেল। কতকগুলি ভগ্ন স্তূপ ছাড়া সহরটার আর কিছুই বাকী রইল না। জন-প্রাণী শূন্য সেই ভাঙ্গা সহরটাও আস্তে আস্তে ধূলা মাটীর নীচে ঢাকা প'ড়ে গেল। বহু শত বছরে সহরটা মাটীর নীচে এমন ভাবে ঢেকে গেল যে, ওখানে যে একটা সহর ছিল সে কথাও লোকে ভুলে গেল। আরো বহু কাল পরে কতকগুলি নূতন লোক এসে আবার ওখানেই আরেকটা নূতন সহর গ'ড়ে তুল্‌ল। এই সহরটাও একদিন আগেরটার মতই প্রাচীন হ'য়ে গেল, সব লোক সহর ছেড়ে চ'লে গেল, আর সহরটাও তার ভাঙ্গা চিহ্ন বুকে ক'রে প'ড়ে রইল। সেই ভাঙ্গাচিহ্নটুকুও আবার দিনে দিনে ধূলা বালির নীচে ঢাকা প'ড়ে গেল। একটার উপর আরেকটা এ রকম অনেকগুলি সহরের ভগ্নাবশেষ একই জায়গায়, আজকাল আমরা দেখ্‌তে পাই। এ রকম ঘটনা বালুময় দেশেই বিশেষ ভাবে ঘটেছে, কারণ সব জিনিষই বালুতে খুব শীগ্‌গীর ঢাকা প'ড়ে যায়।

এ কেমন আশ্চর্য্য ভেবে দেখ তো—বহু নর-নারী শিশুর বাস ভূমি, সহরগুলি, একটির পর একটি ক'রে গ'ড়ে উঠ্‌ল, আর আস্তে আস্তে লোপ পেয়ে গেল। পুরাতনের জায়গায়

নূতনের সৃষ্টি হ'ল, নূতন জন-স্রোত এসে আবার তাদের বাসা বাঁধল, মৃত্যুর স্পর্শে তারাও একদিন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে লোপ পেয়ে গেল। এ-সব প্রাচীন সহরগুলির কাহিনী তো তোমাকে কয়েকটী কথায় শেষ ক'রে দিলাম ; কিন্তু একবার ভেবে দেখ তো কত সহস্র বছর লেগেছিল এই সহরগুলি গ'ড়ে উঠ্‌তে, লোপ পেতে, আবার তারই জায়গায় নূতনের সৃষ্টি হ'তে !

জীবনের সত্তর আশী বছর পার হ'লেই মানুষ বৃদ্ধ হয়, কিন্তু এই সহস্র সহস্র বছরের তুলনায় সত্তর আশী বছর কী-ই বা একটা বয়স ? ঐ সহরগুলির যত দিন অস্তিত্ব ছিল, সেখানেই বার বার কত ছোট শিশুর জন্ম হ'য়েছে, ম'রেছে ! কিন্তু সেই দিনের সমৃদ্ধ বেবিলন, নিনেভার আজ সব লোপ পেয়ে শুধু নামটাই কেবল র'য়েছে।

সিরিয়া প্রদেশে, ডামাস্কাস্ নামে আরেকটা প্রাচীন সহর ছিল। ডামাস্কাস্ কিন্তু আজও লোপ পেয়ে যায় নাই। ডামাস্কাস্ আজও দাঁড়িয়ে র'য়েছে, আর এটা এখনও একটা মস্ত সহর। কারো-কারোর মতে ডামাস্কাসই নাকি আজকাল পৃথিবীর প্রাচীনতম সহর।

ভারতবর্ষেও আমাদের বড় বড় সহরগুলি সবই নদীর তীরে। এদের মধ্যে দিল্লীর কাছে ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল খুব প্রাচীন। ইন্দ্রপ্রস্থের অস্তিত্ব অবশ্য আজকাল লোপ পেয়ে গেছে। বারাণসী অথবা কাশী আরেকটী প্রাচীন সহর। পৃথিবীর

প্রাচীনতম সহরগুলির মধ্যে কাশী অন্যতম। এলাহাবাদ, কাণপুর, পাটনা এমনি আরও কতকগুলি, যা' তোমার জানার মধ্যে, এরাও সব নদীর তীরে। এগুলি খুব প্রাচীন না হ'লেও এলাহাবাদ আর পাটনা যাদের আগে বলা হ'ত প্রয়াগ ও পাটলীপুত্র, বেশ প্রাচীন।

চীন দেশেও এ রকম কতকগুলি প্রাচীন সহর র'য়েছে।

মিশর ও ক্রীট।

প্রাচীন কালে এই সকল সহরে গ্রামে কেমন সব লোক বাস ক'র্‌ত তা' জান্‌বার কৌতূহল তোমার নিশ্চয়ই হচ্ছে। সেই সময়কার তৈরী বড় বড় দালান-কোঠা আর নানা রকমের স্থাপত্য নিদর্শন দেখে সেই যুগের কতকটা ধারণা করা যায়। সেই দিনের কতকগুলি প্রস্তর-লিপিও র'য়েচে, সেগুলি থেকেও অনেক কিছু জানা যায়। আবার, কতকগুলি প্রাচীন পুঁথিও আছে, সেগুলিও সেই যুগের ইতিহাসের মাল-মস্‌লা।

মিশরের পিরামিড আর স্ফিংক্‌স এর (Sphinx) কথা তো শুনেছ। লাক্‌সার এবং অন্যান্য জায়গার বহু প্রাচীন কতকগুলি বিশাল-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের কথাও তুমি জান। এগুলি অবশ্য তুমি দেখ নাই, কিন্তু সুয়েজখালের ভিতর দিয়ে যাবার সময় এদের খুব কাছ দিয়েই আম্‌রা গেছি। এদের ছবি তো তুমি দেখেচ, আর এগুলির ছবির পোষ্টকার্ডও হয়তো তোমার কাছে আছে। স্ফিংক্‌স একটা বিরাট সিংহের প্রতিমূর্ত্তি, এর মাথাটা কিন্তু একটী মেয়ে মানুষের মুখ। এই বিরাট মূর্ত্তিটা যে কেন তৈরী হ'য়েছিল আর কি যে এ বুঝাতে চায় তা কেউ বল্‌তে

মামি।
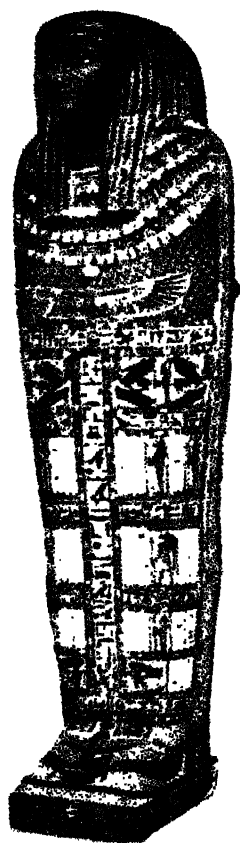
প্রাচীন মিশরীরা মৃত দেহগুলিকে তৈল ও মশলা মেখে এমন ক'রে রেখে দিত, যে সেই মৃত দেহ চার পাঁচ হাজার বছর পরেও আজ পর্য্যন্ত অবিকৃত রয়েচে। এই মামির শবাধারটী মানুষটীর জীবনের বিস্তৃত

পারে না। ঐ মেয়ে মানুষটীর মুখের ভিতর কিন্তু একটি অদ্ভুত মৃদু হাসির রেখা র'য়েছে, লোকে ভেবে পায় না এ হাসির কি অর্থ। স্ফিংক্স এর সাথে কাউকে তুলনা ক'র্লে বুঝবে তার কিছুই বুঝা গেল না।

পিরামিডগুলির গঠনও অতিকায়। এগুলি হ'ল প্রাচীন মিশরের রাজাদের সমাধি-মন্দির। এই রাজাদের বলা হ'ত ফারো (Pharoah). লণ্ডনের British Museumএ যে মামি দেখেছ তোমার হয়তো মনে আছে। এই মামিগুলি হ'ল কোন পশু অথবা মানুষের মৃতদেহ, মস্‌লা মেখে এদের এমন ক'রে রাখা হ'য়েছে যে এগুলি আজও অবিকৃত র'য়েছে, পঁচে নষ্ট হ'য়ে যায় নাই। ফারো (Pharoah) দের মৃতদেহগুলি মামি ক'রে পিরামিডের ভিতর রেখে দেওয়া হ'ত। আর ঐ মামিগুলির কাছে নানা রকমের সোনা রূপার গহনা, আসবাব, খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদিও রেখে দেওয়া হ'ত। কয়েক বছর আগে একটা পিরামিডের মধ্যে, কয়েকজন প্রত্নতাত্ত্বিক মিলে এক ফারোর মামি আবিষ্কার করেছেন। এই রাজার নাম ছিল তুতান-খামেন (Tutan-Khamen), এই মামিটীর কাছে অনেক বহু মূল্য সুন্দর সুন্দর জিনিষও পাওয়া গেছে।

সেই বহু প্রাচীন কালেও কিন্তু মিশরীরা কৃষি আর জল-সেচনের সুবিধার জন্য সুন্দর সুন্দর হ্রদ ও বড় বড় খাল কেটে ছিল। এই থেকেই বুঝ্‌বে প্রাচীন মিশরীরা জ্ঞান বুদ্ধিতে কতদূর উন্নত ছিল। মেরিডুর (Meridu) মত প্রসিদ্ধ হ্রদ ও

বড় বড় খাল কাট্‌বার, পিরামিড তৈরী কর্‌বার, নিশ্চয়ই তাদের খুব ভাল ভাল ইঞ্জিনিয়ার ছিল।

ভূমধ্যসাগরের মধ্যে ক্রীট অথবা কেন্‌ডিয়া (Candia) নামে ছোট্ট একটি দ্বীপ আছে। পোর্টসৈদ থেকে ভেনিসে যাবার পথে এর কাছ দিয়েই আমরা গেছি। বহুদিন আগে এই ছোট্ট দ্বীপটীর মধ্যেও কিন্তু একটা চমৎকার সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছিল। এই ক্রীট দ্বীপের Knossos সহরে, বহু প্রাচীন একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আজও বর্ত্তমান আছে। এই প্রাসাদের ভিতর আজকালকার দিনের মত স্নানের ঘর, জলের কল এসবও রয়েছে। যারা জানে না, তারা তো মনে করে এসব বুঝি আধুনিক যুগেরই আবিষ্কার। সুন্দর সুন্দর মাটীর পাত্র, পাথরের মূর্ত্তি, ছবি, ধাতু ও হাতীর দাঁতের জিনিষ ইত্যাদিও ঐ প্রাসাদে ছিল। এই নিরালা ছোট্ট দ্বীপটীর মাঝে মানুষ বেশ শান্তিতে বাস কর্‌ত আর উন্নতিও করেছিল খুব।

রাজা মিনস্ (Minos) এর গল্প পড়েছ তো? সেই যে রাজা, যিনি যা কিছু ছুঁতেন তাই সোনা হ'য়ে যেত। রাজা বড় বিপদেই পড়েছিলেন কিন্তু, বেচারা কিচ্ছুটী খেতে পর্য্যন্ত পার্‌তেন না—হায় রে, খাবারও যে সব ছুঁলেই সোনা হ'য়ে যায়। সোনা তো আর খাওয়া যায় না। লোভের জন্যই বেচারার এই শাস্তি হ'য়েছিল। গল্পটা অবশ্যি আগাগোড়া বানানো। এই গল্পে এই কথাটাই বুঝানো হ'য়েছে সোনাকে

মানুষ যত মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় মনে করে আসলে তা নয়। ক্রীটের রাজাদের Minos বলা হ'ত, গল্পটা তাদেরই কারুর সম্বন্ধে হবে।

ক্রীট দেশের আরেকটা গল্প আছে, সেটা-ও হয়তো তুমি প'ড়েছ। এই গল্পটা হ'ল মিনোটার (Minotaur) সম্বন্ধে। এই Minotaur-টা ছিল একটা দৈত্য, অর্দ্ধেক মানুষ, অর্দ্ধেক ষাঁড়। দৈত্যটার আহারের জন্য নাকি বালক বালিকাদের এর কাছে বলি দেওয়া হ'ত। তোমাকে আমি আগেই বলেছি, অজানার ভয়েই মানুষের মনে প্রথম ধর্ম্মের চিন্তা এসেছিল। মানুষ প্রকৃতিকে বুঝত না, তার চারদিকে যে সব ঘটনা ঘট্‌চে তার কারণও ছিল তার কাছে অজ্ঞাত, কাজেই ভয় পেয়ে নির্ব্বোধের মত অনেক কিছুই সে ক'রে বস্‌ত। এ খুবই সম্ভব, ছেলে মেয়েগুলিকে বলি দেওয়া হ'ত একটা মনগড়া দৈত্যের কাছে, কোন সত্যিকার দৈত্যের কাছে নয়, কারণ, এ রকম কোন দৈত্য ছিল ব'লেই আমি বিশ্বাস করি না।

প্রাচীন কালে পৃথিবী জুড়ে এ রকম নরবলির একটা প্রথা বিদ্যমান ছিল। মন-গড়া উপাস্য দেবতার নামে নর-নারী-দিগকে বলি দেওয়া হ'ত। মিশর দেশে, মেয়েদের নাইলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হ'ত, লোকে মনে ক'রত তাদের 'পিতা নাইল' এতে তুষ্ট হবেন।

সুখের বিষয় পৃথিবীর অজানা কোণে দু'একটা দেশ ছাড়া নরবলির প্রথা আর এখন কোথাও নাই। কিন্তু এখনও কেহ

কেহ ভগবানের তুষ্টির জন্য পশু বলি দেয়, একটা পশু বলি দিয়ে যে কেমন ক'রে উপাস্য দেবতাকে তুষ্ট করা যায়, ভাব্‌তে কিন্তু আমার ভারী অদ্ভুত ঠেকে।
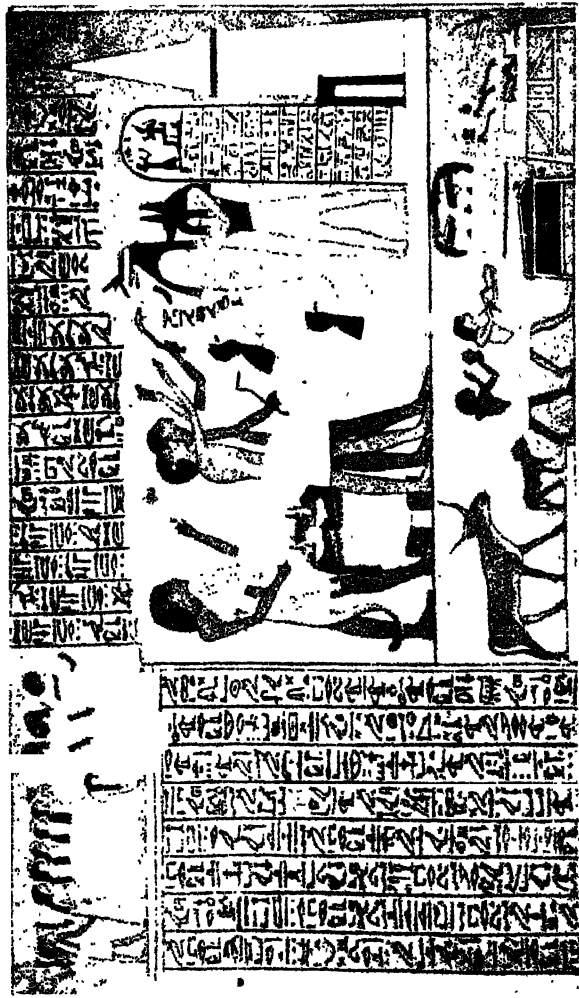
মিশর দেশের একখানা প্রাচীন চিত্র।

একুশের চিঠি

চীন ও ভারতবর্ষ।

আমরা দেখেছি, মেসোপোটামিয়া, মিশর এবং ভূমধ্য-সাগরের ছোট্ট ক্রীট দ্বীপে, প্রাচীন যুগে কোন এক সময় সভ্যতার বিকাশ ও উন্নতি হ'য়েছিল। ঠিক সেই সময়েই চীন এবং ভারতবর্ষেও দুইটী বিশাল সভ্যতার সূচনা হয় এবং নিজ নিজ ধারায় উন্নতির পথে অগ্রসর হ'তে থাকে।

অন্যান্য দেশের মত চীন দেশেও বড় বড় নদীর উপত্যকা ভূমিতেই মানবের প্রথম বসবাস আরম্ভ হ'য়েছিল। এই মানুষদের আমরা বলি মোঙ্গলিয়ান। এরা প্রথম কাঁসার সুন্দর সুন্দর বাসন তৈরী ক'র্‌ত, পরে লোহার ব্যবহারও এরা শিখেছিল। এরা খাল কাট্‌ত, বড় বড় বাড়ী নির্ম্মাণ ক'র্‌ত এবং লিখবারও একটা সুন্দর প্রণালী এরা আবিষ্কার করেছিল। এদের লেখার ধরণটা কিন্তু হিন্দি, বাংলা, ইংরেজী, অথবা উর্দ্দুর চেয়ে একেবারে ভিন্ন ছিল। এ ছিল একরকমের ছবির লিখন। প্রত্যেকটী শব্দ, কখনও বা একটি ছোট বাক্যকেই ছবির দ্বারা প্রকাশ করা হ'ত। প্রাচীন মিশর, ক্রীট, বেবিলনেও এ রকম ছবির লেখার প্রচলন ছিল। এ রকম লেখাকে আজকাল

বলা হয় হিরোগ্লাফি (Hieroglyphy)। কোনো কোনো মিউসিয়মে এ রকম ছবির লেখা বই তুমি দেখেচ। মিশরে এবং পশ্চিমের কোনো কোনো দেশে এ রকমের লেখা, কেবল বহু প্রাচীন দালানের গায়েই দেখা যায়, বহু দিন ধ'রে ঐ সব দেশে আর এই ধরণের লেখার প্রচলন নাই। চীন দেশের লেখাটা কিন্তু এখনও ছবি আঁকা। এই লেখার গতিটা সাধারণ প্রচলিত বা-থেকে ডান দিকে নয়, উর্দ্দুর মত ডান থেকে বা-দিকেও নয়, এর গতি উপর থেকে নীচ দিকে।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ধ্বংসাবশেষগুলি আজও বেশীর ভাগই মাটীর নীচে ঢাকা রয়েচে। মাটী খুঁড়ে এগুলি বের না করা পর্য্যন্ত ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষীগুলি আমাদের চোখের আড়ালেই থেকে যাবে। পাঞ্জাবের হারাপ্পা এবং সিন্ধু প্রদেশের মহেঞ্জোদারো নামক স্থানে অনেকগুলি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ইতিমধ্যে মাটীর নীচে পাওয়া গেছে।

আর্য্যদের ভারতবর্ষে আগমনেরও বহু পূর্ব্বে এ দেশে যে দ্রাবীড় জাতির বাস ছিল তা' আমরা জানি। একটা চমৎকার সভ্যতা এরা গ'ড়ে তুলেছিল। অন্যান্য দেশের সাথে তারা ব্যবসা বাণিজ্যও ক'র্‌ত। মেসোপোটামিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে তারা তাদের বাণিজ্য দ্রব্যাদি পাঠাত। সমুদ্রের পরপারে চাউল আর মশ্‌লা (যেমন গোলমরিচ) রপ্তানী করা হ'ত। কেহ কেহ বলেন মেসোপোটাম্যিয়ার উর সহরের প্রাচীন প্রাসাদগুলি তৈরী করবার জন্য দক্ষিণ ভারত থেকে সেগুন

কাঠের চালান দেওয়া হয়েছিল। সোনা, জহরৎ, হাতীর দাঁত, ময়ূর, বানর এ সব যে ভারতবর্ষ থেকে পশ্চিম দেশে রপ্তানী হ'ত তাও জানা যায়। কাজেই দেখ সেই প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশের সাথে ব্যবসার আদান-প্রদান ছিল। সভ্য মানুষের মধ্যেই ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচলন সম্ভব।

ভারতবর্ষ এবং চীন এই দুইটী দেশেই প্রাচীন যুগে কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। এই দুইটী দেশের কোনটীই কোন সময়ে একজন শাসনকর্ত্তার অধীনে ছিল না। প্রত্যেকটী নগর আর তার আশেপাশের গ্রাম মাঠগুলি একটি শাসন নিয়মের অধীনে ছিল। এই গুলিকে আমরা বলি নাগরিক রাষ্ট্র। সেই প্রাচীন কালেও কিন্তু এই সব নাগরিক রাষ্ট্রের অনেক গুলিতেই গণ-তান্ত্রিক শাসন প্রচলিত ছিল। কোন রাজা ছিল না, জনসাধারণের মনোনীত একজন পঞ্চায়েত শাসন কার্য্য চালাতেন। কোন কোন রাষ্ট্রের অবশ্য রাজাও ছিল। প্রত্যেকটী রাষ্ট্রের নিজ নিজ শাসন নিয়ম থাকলেও, পরস্পরকে সাহায্য করবার রীতিও ছিল। অনেক সময় একটা বড় রাষ্ট্রকে কতকগুলি ছোট রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় বলে মেনে নেওয়া হ'ত।

চীন দেশে ক্রমে ক্রমে এই ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলিই সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে একটা বড় রাষ্ট্র অথবা মহারাজ্যের সৃষ্টি করেছিল। চীনের মহারাজ্য যখন স্থাপিত হয়, তখনই চীনের মহাপ্রাচীরও তৈরী হ'য়েছিল। এই প্রাচীরের কথা তুমি পড়েছ, এর

বিশালতার কথাও তুমি জান। অন্যান্য মোঙ্গল জাতিরা যাতে চীন রাজ্য আক্রমণ করতে না পারে তার জন্যই এই প্রাচীর সমুদ্র থেকে আরম্ভ ক'রে উত্তর দিকের বড় বড় পাহাড়গুলি পর্য্যন্ত গেথে নেওয়া হ'য়েছিল। এই বিশাল প্রাচীর ১৪০০ মাইল লম্বা, ২০ থেকে ৩০ ফিট পর্য্যন্ত উঁচু, আর ২৫ ফিট চওড়া। প্রাচীরের মাঝে মাঝে দুর্গ আর গম্বুজ আছে। ভারতবর্ষে এ রকম একটা প্রাচীর তৈরী হ'লে, সেটা লম্বা হ'ত উত্তরে লাহোর থেকে দক্ষিণে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত। এই মহাপ্রাচীর বহু দিন ধ'রে আজও দাঁড়িয়ে আছে, চীন দেশে গেলে দেখ্‌বে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমুদ্রযাত্রা।

ফিনিসিয়ানরা প্রাচীন যুগের আরেকটী বিশিষ্ট জাতি। ইহুদি, আরব আর ফিনিসিয়ানরা একই জাতি। এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে (বর্ত্তমান তুরস্ক) এদের বাস ছিল। তাদের প্রধান নগরগুলির নাম ছিল, একার, টায়র, সাইডন ; এগুলি ভূমধ্য-সাগরের কূলে অবস্থিত ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বহু দূর দেশে সমুদ্র যাত্রা ছিল এদের বৈশিষ্ট্য। ভূমধ্য-সাগরের সমস্তটাতেই তাদের গতায়াত ছিল, সমুদ্র পথে ইংলণ্ড পর্য্যন্তও এরা যেত। কে জানে, ভারতবর্ষেও হয়তো আস্ত।

এবার সমুদ্রযাত্রা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, এ দু'টা ঘটনার বিস্ময়কর সূচনার কথায় এসে পড়েছি। প্রত্যেকটাই আরেকটার উন্নতির পথে সাহায্য করেছিল। আজকের দিনের মত সুন্দর সুন্দর জাহাজ ষ্টিমার কিন্তু সে দিনে ছিল না। একটা গাছের গুড়িকে গর্ত্ত ক'রেই হয়তো প্রথম নৌকা তৈরী হ'য়েছিল। সাথে দাঁড় ব্যবহার করা হ'ত, আর সময় সময় বাতাসের ভরে পাল তুলে দেওয়া হ'ত। সে দিনের সমুদ্রযাত্রা

ছিল নিশ্চয়ই খুব বিস্ময়কর, চমকপ্রদ। একখানা ছোট্ট নৌকা, দাঁড়, আর পাল, এই নিয়ে তুমি আরব সাগর পাড়ি দিচ্ছ—ভাব্‌তে কেমন লাগে? নড়বার-চড়বার বেশী জায়গা নেই, আর অল্প একটু বাতাস উঠ্‌লেই নাগরদোলা খেতে খেতে একেবারে সমুদ্রের নীচে টুপ্‌। খুব সাহসী লোক ছাড়া সমুদ্রের বুকে এমন ক'রে যেতে কে সাহস করে বল? বিপদেরও সীমা ছিল না, মাসের পর মাস হয়তো তীরের নাগালই পাওয়া যেত না। খাবার টান পড়্‌লে, সেই মাঝ দরিয়ায়, মাছ ধর্‌তে অথবা দু'একটা পাখী না মার্‌তে পার্‌লে আর খাবার যোগার কর্‌বার কোন উপায়ই ছিল না। সমুদ্র ছিল সে দিন বিপদ বাধায় পূর্ণ, রহস্যে ঘেরা। সে দিনের নাবিকদের বহু গল্প, সমুদ্রের বহু অদ্ভুত ঘটনার কথা আজও মানুষের মুখে মুখে চ'লে আস্‌ছে।

এত বিপদ ঘাড়ে ক'রেও মানুষ সে দিন সমুদ্র পাড়ি দিত। কেউ কেউ হয়তো অজানা বিপদের সম্মুখীন হ'তে ভালবাসত বলেই সমুদ্র যাত্রা ক'র্‌ত, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই সোনা আর ধনের লোভে এ কাজ ক'র্‌ত। তারা ব্যবসা ক'র্‌তে বিভিন্ন দেশে জিনিষ কেনা বেচা ক'র্‌তেই সমুদ্র-পথে যাতায়াত ক'র্‌ত। এমনি ক'রে ব্যবসা দ্বারা তারা ধন উপার্জ্জন ক'র্‌ত।

আচ্ছা, ব্যবসা কি, আর কেমন করেই বা এর আরম্ভ হ'ল? চারিদিকেই তো এখন বড় বড় দোকান রয়েছে, তোমার দরকার হ'লেই চট্‌ ক'রে একটা দোকানে ঢুকে তোমার

ইচ্ছামত জিনিষ কিনে আন্‌চ। কিন্তু এই যে তুমি একটা জিনিষ কিনে এনেচ, এ আস্‌ল কোথা থেকে, কখনো ভেবে দেখেচ? এলাহাবাদের একটা দোকান থেকে তো একখানা উলের শাল কিনে আন্‌লে, কিন্তু ভেবে দেখ, এই শাল খানা হয়তো সেই কাশ্মীর থেকে এতটা পথ এসেছে, আর পশম গুলি হয়তো জন্মেছিল, কাশ্মীর অথবা লাদাক্‌ পাহাড়ের ভেড়ার গায়। যে টুথ পেষ্টটা কিনে এনেচ, তা' হয়তো জাহাজ আর রেলে চ'ড়ে আমেরিকা থেকে এসেচে। আবার চীন, জাপান, প্যারী অথবা লণ্ডনের তৈরী জিনিষও হয়তো তুমি কিন্‌তে পার। আচ্ছা, একখানা বিলাতী কাপড়ের কথাই ধরা যাক, যা এখানকার বাজারে বিক্রি হ'য়েছে। এর তুলাটা জন্মেছিল ভারতবর্ষে, সেটাকে পাঠান হ'ল ইংলণ্ডে, সেখানে একটা বড় ফ্যাক্টরী তুলাটাকে কিনে নিল, পরিষ্কার করল, সূতা তৈরী ক'র্‌ল, তারপর তার থেকে কাপড় তৈরী হ'ল। এই কাপড় খানাই শেষে ঘুরে এসে ভারতবর্ষের বাজারে বিক্রি হ'ল। কাপড়খানা বিক্রি হবার আগে, আগু পিছু ক'রে অনেক হাজার মাইল ঘুরে এল। এটা তোমার কাছে নিশ্চয়ই ভারী বোকামী মনে হবে যে, যে তুলাটা ভারতবর্ষে জন্মেছিল, সেটাই কাপড় তৈরী হবার জন্য গেল ইংলণ্ডে, তারপর আবার ফিরে এল ভারতবর্ষে। কতটা সময়, অর্থ ও শক্তির অপচয় হ'ল ভেবে দেখতো! তুলাটাকে যদি ভারতবর্ষেই কাপড় তৈরী করা যেত, তবে অনেক সস্তাও হ'ত ভালও হ'ত। জানইত

আমরা বিলাতী কাপড় কিনিও না পরিও না। আমরা খদ্দর পরি, কারণ, যতটা সম্ভব আমাদের স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। খদ্দর আমাদের এই কারণেও পরা উচিত যে, যে সব গরীব লোকেরা সূতা কাটে, কাপড় বুনে, তাদেরও এতে সাহায্য করা হবে।

কাজেই দেখ, আজকাল ব্যবসা জিনিষটার বড় ঘোর-প্যাঁচ। বড় বড় জাহাজগুলি অনবরত এক দেশের জিনিষ নিয়ে আরেক দেশে যাওয়া আসা ক'র্‌চে। প্রথম থেকেই অবশ্য ব্যবসার এই রীতি ছিল না।

একেবারে প্রথম অবস্থায়, মানুষ যখন সবে মাত্র বসবাস স্নুরু করেছে, ব্যবসা বাণিজ্য বলে তখন বড একটা কিছু ছিল না। মানুষের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিষই যার যার নিজের যোগার ক'রে, নয়তো নিজের হাতে তৈরী ক'রে নিতে হ'ত। তার পরের অবস্থাটা তো তোমাকে এর আগেই বলেছি — মানুষের সমাজে কর্ম্ম-বিভাগ আরম্ভ হ'ল ; প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন কাজ ছিল, আর প্রত্যেক জিনিষ তৈরী কর্‌বারও ভিন্ন ভিন্ন লোক ছিল। কখন কখন হয়তো এমন হয়েছে যে দুইটী দলের কাছে দুইটী ভিন্ন জিনিষ বেশী পরিমাণে জমা হ'ল। তখন নিজেদের সুবিধার জন্য তারা জিনিষের অদল-বদল ক'রে নিত। যেমন ধর, একটা গরুর বদলে একটী দল, আরেকটী দলের কাছ থেকে এক ছালা শস্য নিয়ে নিল। টাকা পয়সা তো আর সে দিনে ছিল না, কাজেই কেবল

জিনিষের বিনিময়ই চল্‌ত। এরকম ক'রেই দ্রব্য বিনিময় আরম্ভ হ'ল। এটা অবশ্য খুবই অসুবিধার ব্যাপার ছিল। এক ছালা শস্য অথবা এমনি কোন একটা জিনিষের প্রয়োজন হ'লে মানুষকেএকটা গরু অথবা এক জোড়া ভেড়া নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হ'ত। কিন্তু তা' হ'লেও আস্তে আস্তে এই ভাবেই ব্যবসার বৃদ্ধি হ'তে লাগ্‌ল।

যখন সোনা রূপার আবিষ্কার হ'ল তখন ব্যবসার জন্য ঐ সব ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ হ'ল। যার মাথায় প্রথম ধাতু-বিনিময়ের বুদ্ধিটা এসেছিল, সে নিশ্চয়ই খুব বুদ্ধিমান লোক ছিল। ব্যবসা ক্ষেত্রে সোনা রূপার ব্যবহার আরম্ভ হ'ওয়ায় ব্যবসার রীতিটাও অনেক সহজ হ'ল। তখন পর্য্যন্তও কিন্তু আজকের মত মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হয় নাই। সোনাটাকে ওজন ক'রে আরেক জনকে দেওয়া হ'ত। এর অনেক পরে মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হ'ল। এতে ব্যবসার পথও অনেক সহজ হ'ল। ওজন কর্‌বার প্রয়োজন ছিল না, কারণ, প্রত্যেক মুদ্রার মূল্যই সকলের জানা ছিল। আজকাল মুদ্রার ব্যবহার সব দেশেই আছে। কিন্তু মনে রেখ, টাকা পয়সার অম্‌নি কোন মূল্য নেই। আমাদের দরকারী জিনিষ গুলি কিন্‌বার সুবিধা হয় বলেই টাকা পয়সার যা মূল্য, এরা দ্রব্য বিনিময়ের সাহায্য করে। রাজা মিনসের কথা মনে আছে তো? বেচারার সোনার অভাব ছিল না তবু খাওয়া জুট্‌ত না। কাজেই দেখ, আমাদের দরকারী জিনিষ কিনবার

সুবিধা ছাড়া টাকা পয়সার কোন মূল্যই নাই।

অনেক গ্রামেই দেখ্‌বে আজ পর্য্যন্তও দ্রব্য বিনিময়ের প্রথা রয়ে গেচে, সেখানে টাকা পয়সার বালাই নাই। সুবিধার জন্যেই টাকা পয়সার ব্যবহার হয়। এমন বোকা লোকেরও অবশ্য অভাব নাই, যারা মনে করে টাকাটারই যথেষ্ট মূল্য, কাজেই তারা যা কিছু উপার্জ্জন করে, তাই সঞ্চয় করে, টাকার সদ্ব্যবহার তারা জানে না। এর মানে, ওরা জানে না টাকা পয়সার ব্যবহার কেমন ক'রে আরম্ভ হ'ল, আর এই টাকা পয়সার আসল মূল্যই বা কি।

তেইশের চিঠি

ভাষা, লিপি ও সংখ্যা প্রণালী।

বিভিন্ন ভাষা আর তাদের সম্পর্কের কথাটা এর আগেই বলেচি। ভাষার সৃষ্টি হ'ল কি ক'রে সেই কথাটাই এখন বল্‌ব।

দেখা যায়, কোন কোন জাতের পশুর মধ্যেও এক রকমের কথাবার্ত্তার চল আছে। বানরদের মধ্যে তো নাকি কয়েকটা সাধারণ জিনিষ বুঝাবার জন্য কয়েক রকমের চীৎকার অর্থাৎ কয়েকটা শব্দের ব্যবহার আছে। তুমি হয়তো লক্ষ্য করেচ, কোন কোন পশু ভয় পেয়ে তাদের জাতের অন্যান্যদের সতর্ক কর্‌বার জন্য এক রকমের অদ্ভুত চীৎকার করে।

মানুষের মধ্যেও হয়তো প্রথম ভাষার সৃষ্টি হ'য়েছিল এম্‌নি ক'রেই। প্রথম অবস্থায়, খুব সম্ভব, ভয় এবং সতর্কতা প্রকাশের জন্য কয়েকটা বিশেষ রকমের চীৎকার করা হ'ত। তারপর হয়তো আরেক রকমের আওয়াজ উদ্ভাবন হ'ল যাকে বলা যায় 'শ্রম-রব'। যখন কতকগুলি লোক এক সঙ্গে কোন কাজ করে, তাদের সমস্বরে একটা চীৎকার ক'র্‌তে শুনা যায়। কোন কিছু এক সঙ্গে টানাটানি অথবা একটা ভারী জিনিষ তুল্‌বার সময় সকলে মিলে যে একটা রব তুলে তা তুমি হয়তো শুনেচ। মনে হয়, সবাই মিলে এই রকম ঐক্য-রব ক'রে, যেন তারা

নিজেদের মধ্যে একটু জোর পায়। এই রকমের 'শ্রম-রব'ই হয়তো মানুষের মুখের আদিম শব্দ।

তারপর আস্তে আস্তে ছোট ছোট আরও সব শব্দের সৃষ্টি হ'ল, যেমন—জল, আগুন, ঘোড়া, শূয়র। এইগুলি বুঝাবার জন্য তারা যে কি শব্দ প্রথম ব্যবহার ক'রত তা' অবশ্য এখন আর আমাদের জানা নেই। প্রথম অবস্থায় হয়তো কেবল নাম-বাচক শব্দেরই ব্যবহার ছিল, ক্রিয়া-বাচক শব্দ ছিল না। ধর, কেহ যদি বুঝাতে চাইত সে একটা শূয়র দেখেচে, সে ক'র্‌ত কি জান?—"শূয়র" এই ব'লে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিত—শিশুদের মত আর কি! সেই দিনে কথাবার্ত্তা কারোর সাথে কারোর বড় একটা নিশ্চয়ই হ'ত না।

তারপর আস্তে আস্তে ভাষার পরিণতি আরম্ভ হ'ল। প্রথম ছোট ছোট বাক্য, তারপর আরেকটু বড়, এ রকম ভাবে। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে মাত্র একটা ভাষা হয়তো কোন কালেই ছিল না। কিন্তু এমন এক সময় নিশ্চয়ই ছিল, যখন অনেকগুলি বিভিন্ন ভাষা ছিল না, প্রত্যেকটার থেকেই শেষে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি ক'রে উপভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

এখন যে সময়কার প্রাচীন সভ্যতার কথা বল্‌ছি, সেই সময়ের মধ্যে ভাষার অনেক উন্নতি হয়েছে। অনেক গানের রচনা হয়েছিল, আর সেগুলি চারণ আর গায়কেরা গেয়ে গেয়ে বেড়াত। লেখার অথবা বইয়ের প্রচলন অবশ্য তখনও খুব হয় নাই, কাজেই মানুষকে সে দিনে অনেক কিছুই মনে ক'রে
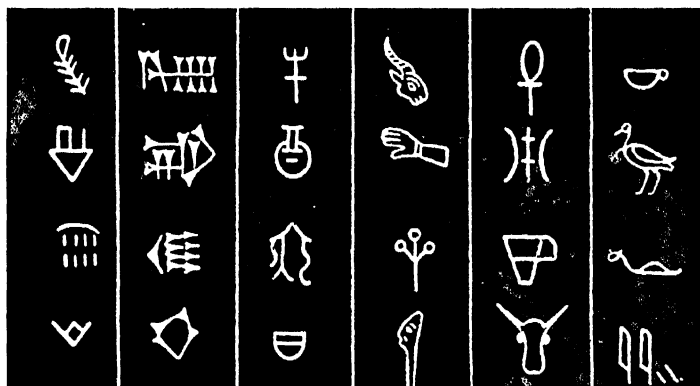
হিরোগ্লাফি বা ছবির লেখা।

প্রাচীন মিশর, বেবিলোন ক্রীট ও চীন দেশে এক রকমের ছবির লেখার প্রচলন ছিল। সব লেখাই হয়তো প্রথম ছবি দিয়ে আরম্ভ হ'য়েছিল। এই ছবিগুলিই আস্তে আস্তে খুব সংক্ষেপ হ'তে লাগল, আর তার থেকেই বহু পরে বর্ণমালার আবিষ্কার হ'য়েছে।

রাখ্‌তে হ'ত। পদ্য মনে রাখা অনেক সহজ ; কাজেই প্রাচীন-যুগের সব সভ্য দেশেই পদ্যও গাঁথার খুব প্রচলন ছিল।

গায়ক অথবা চারণেরা মৃত বীর পুরুষদের গৌরব-গাঁথা গাইতে খুব ভালবাস্‌ত। সে দিনের মানুষ ছিল খুব যুদ্ধপ্রিয়, কাজেই গানগুলিও ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের বীরত্ব-কাহিনী। ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য সব সভ্য দেশেই এই গান আর গাঁথাগুলি খুব লোকপ্রিয় ছিল।

লেখার আরম্ভটা শুন্‌তেও তোমার খুব ভাল লাগ্‌বে। চীন দেশের লেখার কথা আগেই বলেচি। সব লেখাই হয়তো প্রথম ছবি দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল। ধর, কেহ যদি ময়ূর সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে চাইত, সে হয়তো একটা ময়ূরের ছবি এঁকে তাই বুঝাতে চেষ্টা ক'র্‌ত। অবশ্য এ রকম ভাবে আর অনেক কথা লেখা সম্ভব নয়। এই ছবিগুলিই আস্তে আস্তে খুব সংক্ষেপ হ'তে লাগ্‌ল, আর তার থেকেই বহু পরে বর্ণমালার কথা কেহ ভেবে আবিষ্কার করেছিল। সেই থেকেই লেখাটাও খুব সহজ হ'য়ে গেল আর ভাষারও দ্রুত উন্নতি হ'তে লাগ্‌ল।

সংখ্যা প্রণালী: এবং গণনা মানুষের আরেকটা মস্ত আবিষ্কার। সংখ্যা ছাড়া যে কেমন ক'রে ব্যবসা চল্‌তে পারে ভাবা যায় না। এই সংখ্যার আবিষ্কার যিনি প্রথম ক'রেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই একজন মস্ত প্রতিভাবান ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। ইউরোপে সংখ্যাগুলি প্রথমে বড়ই হিজিবিজি ছিল। রোমান সংখ্যার কথা জান ত? এদের এমনি লেখা হয়—I, II, III, IV,

V. VI, VII, VIII, IX, X, ইত্যাদি। বড্ড হিজিবিজি, এদের ব্যবহার মোটেই সহজ নয়। আজকাল সব ভাষাতেই আরবী প্রণালীর সংখ্যা ব্যবহার হয় এই প্রণালীটা অনেক সহজ—১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০।

ইউরোপের লোকেরা আরবদের কাছ থেকে এই প্রণালীটা শিখেছিল, তাই তারা এর নাম দিয়েছে আরবি। আরবেরা নিজেরা কিন্তু এই প্রণালীটা ভারতবর্ষের কাছ থেকে শিখেছিল, কাজেই সত্যি বল্‌তে একে ভারতীয় বলাই উচিত।

কিন্তু বড্ড তাড়াতাড়ি দৌড়ুচ্চি। আরবদের কথা তোমাকে এখনও কিছুই বলা হয় নাই।

চব্বিশের চিঠি

সমাজে শ্রেণী বিভাগ।

ছোট ছেলেমেয়েদের তো বটেই, বড়দেরও ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয় এক অদ্ভুত রীতিতে। রাজাদের নামধাম, যুদ্ধ ইত্যাদির সন তারিখ এ সবই কেবল শিখানো হয়। কিন্তু মনে রেখ, ইতিহাস কেবল কয়েকটি যুদ্ধ আর কয়েকজন রাজা সেনাপতির কথাই নয়। ইতিহাস আমাদের বলে দেয়, একটা দেশের ও একটা জাতির কথা, তাদের জীবনধারণের রীতির কথা, তাদের কর্ম্মধারা ও তাদের চিন্তাধারার কথা। ইতিহাস আমাদের বলে দেয়, একটা জাতির সুখ দুঃখের কথা, তাদের বাধা বিপত্তির কথা, আর সেই বাধা বিপত্তি তারা কেমন ক'রে জয় ক'রেছিল তার-ই কথা। এ রকম ভাবে ইতিহাস আলোচনা ক'র্‌লে আমরা অনেক কিছুই শিখ্‌তে পার্‌ব। আমরা যদি ঐ একই রকমের বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হই, ইতিহাসের শিক্ষা আমাদিগকে বলে দেবে কেমন ক'রে তাকে জয় করা যায়। বিশেষতঃ, অতীত দিনের ইতিহাস আলোচনা ক'রেই আমরা বুঝ্‌তে পারি, কোন একটা জাতি ভালোর দিকে যাচ্চে কি মন্দের দিকে; উন্নতির দিকে যাচ্চে, কি অবনতির দিকে।

অবশ্য অতীত কালের প্রসিদ্ধ নর-নারীদের জীবনী থেকে

আমাদের যা' শিখ্‌বার আছে তা' শিখ্‌তে হ'বে, কিন্তু অতীত কালে বিভিন্ন জাতির অবস্থা কেমন ছিল তা'ও আমাদের জান্‌তে হবে।

তোমাকে তো অনেকগুলি চিঠি লিখেছি. এইখানা নিয়ে চব্বিশখানা। কিন্তু এই পর্য্যন্ত, যে অতীত কলের কথা বিশেষ কিছুই জানি না, তার কথাই বলেছি। একে আর সত্যিকার ইতিহাস বলা চলে না। একে হয়তো বলা চলে, ইতিহাসের সূচনা অথবা ইতিহাসের উষাকাল। এর পরে যে যুগের কথা বল্‌ব, তার বিষয় আমরা অনেক কিছু জানি, ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় করাও তার চলে। কিন্তু প্রাচীন সভ্যতার কথা শেষ কর্‌বার আগে, আরেকবার সেই যুগে একটু উঁকি মেরে, সেই দিনে কি রকম সব বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিল তাই দেখে নিই।

আমরা আগেই দেখেচি, কোন এক সময় প্রাচীন যুগের দলগুলির মধ্যে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কর্ম্ম ক'র্‌তে আরম্ভ ক'র্‌ল, অর্থাৎ কর্ম্ম বিভাগের সূচনা হ'ল। আরো দেখেচি, দলের কর্ত্তা আর তার পরিবার দলের' অন্যান্যদের চেয়ে একটি বিশিষ্ট শ্রেণী হ'য়ে গেল। দলপতি নিজের হাতে কেবল দল পরিচালনার ভারটাই রাখ্‌ল। সে আর তার পরিবারের লোকেরা উঁচু দরের মানুষ হ'য়ে দাঁড়াল। এমনি ক'রেই দেখ, মানুষের সমাজে দুইটী শ্রেণীর সৃষ্টি হ'ল ; এক শ্রেণীর কাজ ছিল আদেশ করা, কর্ম্ম পরিচালনা করা, আর অন্য শ্রেণীর কাজ ছিল শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা কাজটী সম্পন্ন করা। অবশ্য

যে শ্রেণীর হাতে পরিচালনার ভার ছিল, তাদের ক্ষমতাও ছিল বেশী, আর এই ক্ষমতার জোরেই তারা যতটা সম্ভব জিনিষের বড় ভাগটাই গ্রহণ ক'র্‌ত। শ্রমিকদের কাছ থেকে বড় ভাগটা গ্রহণ ক'রেই তারা হ'ল ধনী।

আবার সমাজে কর্ম্ম-বিভাগ যতই প্রসার পেতে লাগ্‌ল, সাথে সাথে আরো কতকগুলি শ্রেণীরও উদ্ভব হ'ল। প্রথমেই ধর, রাজা তার পরিবার আর পারিষদের দল। দেশ শাসন আর যুদ্ধের কাজ এরাই ক'র্‌ত। এ ছাড়া আর বড় বেশী কিছু তারা ক'র্‌ত না।

তারপর, মন্দিরের সব পুরুত আর তাদের সব আনুসঙ্গিক কর্ম্মচারী। এই পুরুতেরা কিন্তু দেশের মধ্যে একটি বিশিষ্ট শ্রেণী ছিল, তাদের বিষয় পরে আরো বল্‌ব।

তৃতীয় আরেকটী শ্রেণী হ'ল সওদাগর। এরা ব্যবসার জন্য এক দেশের দ্রব্যাদি অন্য দেশে নিয়ে যেত, দোকান খুলে কেনা বেচার কাজ ক'র্‌ত।

তারপর আরেকটি শ্রেণী হ'ল কারিগর, এরা সব রকমের জিনিষ তৈরী ক'র্‌ত। তাদের কেউ সূতা কাট্‌ত, কেউ কাপড় বুন্‌ত, কেউ মাটীর জিনিষ তৈরী ক'র্‌ত আর কেউবা কাসার বাসন তৈরী ক'র্‌ত ; সোনার কাজ, হাতীর দাঁতের কাজ আর এমনি সব অন্যান্য হস্তশিল্পের কাজও এরাই ক'র্‌ত। এদের বেশীর ভাগই সহরে অথবা তার আশে পাশে বাস ক'র্‌ত। কেউ কেউ গ্রামেও বাস ক'র্‌ত।

সর্ব্বশেষ, আরেকটী শ্রেণী হ'ল কৃষক ও মজুর। কৃষকেরা মাঠে কাজ ক'র্‌ত আর মজুরেরা যেত সহরে। এই কৃষক ও মজুরের শ্রেণীই ছিল সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী। কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীর কাছ থেকে এরা কখনো উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেত না, সবাই চাইত এই বেচারাদের ঠকাতে।

রাজা, পুরোহিত ও মন্দির।

আমার আগের চিঠিতে পাঁচটী শ্রেণী বিভাগের কথা বলেছি। কৃষক এবং মজুর শ্রেণীর লোকেরাই ছিল সংখ্যায় সব চেয়ে বেশী। কৃষকেরা লাঙ্গল দিয়ে মাটী চাষ ক'রে শস্য উৎপাদন ক'র্‌ত। কৃষকেরা যদি কৃষির কাজ না ক'র্‌ত, আর অন্যান্য লোকেরাও যদি কেহই মাঠের কাজ না ক'র্‌ত, তবে আর সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের নিশ্চিন্ত মনে ভরপেটের আহার জুটান সম্ভব হ'ত না। কাজেই কৃষকেরা ছিল সমাজের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। এরা না হ'লে সবাইকে উপোস ক'রেই ম'র্‌তে হ'ত। মজুরেরাও মাঠে এবং সহরে অনেক প্রয়োজনীয় কাজ ক'র্‌ত। মানুষের মুখের আহার যোগান দিত এই কৃষক ও মজুর শ্রেণী, সমাজের পক্ষেও প্রয়োজনীয় ছিল এরাই সবচেয়ে বেশী; কিন্তু তা'রা যা-কিছু উৎপাদন ক'র্‌ত তার বেশীর ভাগটাই যেত অন্যের হাতে, বিশেষ ক'রে রাজা আর তারই সমশ্রেণীর অভিজাতদের হাতে।

আমরা দেখেছি, রাজা এবং তা'র শ্রেণীর লোকদের হাতেই খুব বেশী ক্ষমতা ছিল। দল সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় জমির মালিক ছিল সমস্ত দলটী, জমি কারুর নিজস্ব সম্পত্তি ছিল না।

কিন্তু রাজ-সম্প্রদায়ের ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে এরা বল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লেন, জমির মালিকও তারাই। তা'রা হ'য়ে গেল জমিদার, আর কৃষক শ্রেণী, যারা হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে জমির কাজ ক'র্‌ত তা'রা হ'য়ে গেল জমিদারের ভৃত্য। কৃষক জমি থেকে যা-কিছু উৎপাদন ক'র্‌ত, তারই ভাগ হ'ত বড়, ভাগটা অবশ্যই যেত জমিদারের দিকে।

কোন কোন মন্দিরেরও আবার জমি ছিল, আর পুরুতেরা ছিল জমিদার।

এখন মন্দির আর মন্দিরের পুরুতদের কথা তোমাকে বল্‌ব। তোমাকে এর আগে একখানা চিঠিতে লিখেছি, আদিম-যুগের মানুষেরা অনেক প্রাকৃতিক ঘটনার কারণই ঠিক ঠিক বুঝ্‌তে না পেরে ভয় পেত; এই ভয় থেকেই ঈশ্বর আর ধর্ম্মের চিন্তা মানুষের মনে প্রথম এসেছিল। নদী, পাহাড়, সূর্য্য, গাছ, পশু এদের সব কিছুকেই তারা দেব-দেবী ব'লে মনে ক'র্‌ত, কতকগুলি ছিল আবার অদৃশ্য মনগড়া ভূত। ভয় তাদের মনে লেগেই ছিল, কাজেই তা'রা মনে ক'র্‌ত দেবতা বুঝি তা'দের শাস্তি দিবার জন্যই সব সময় ব্যস্ত। তা'রা ভাব্‌ত দেবতা বুঝি তা'দেরই মত কর্কশ আর নিষ্ঠুর; কাজেই, একটা পশু, পাখী অথবা মানুষ বলি দিয়ে তা'রা চাইত দেবতাকে ঠাণ্ডা রাখ্‌তে।

এই দেবতাদের পূজার জন্য আস্তে আস্তে সব মন্দির গ'ড়ে উঠ্‌ল। মন্দিরের মধ্যে একটা বিশেষ স্থান ছিল যাকে বলা

হ'ত 'পূজা-ঘর', সেখানেই তা'দের আরাধ্য দেবতার থাক্‌ত। কিছু চোখের সাম্‌নে না দেখে আর কেমন ক'রে পূজা কর্‌বে? সেটা কঠিন। একটি ছোট শিশুতো কেবল যা' দেখে তার বিষয়ই চিন্তা ক'র্‌তে পারে। এই আদিম মানুষেরাও তো শিশুদের মতই ছিল। কোন মূর্ত্তি না দেখে তা'দের পক্ষে পূজা করা সম্ভব ছিল না, কাজেই মন্দিরে দেবতার মূর্ত্তি স্থাপন ক'র্‌ত। কিন্তু ভারী আশ্চর্য্য, মূর্ত্তিগুলি প্রায়ই ছিল ভয়ঙ্কর আর বিশ্রী। কোন কোনটী ছিল পশুর মত, আবার কোন কোনটি ছিল অর্দ্ধেক পশু অর্দ্ধেক মানুষ। মিশর দেশে এক সময় একটা বিড়ালের মূর্ত্তি, আরেক সময় একটা বানরের মূর্ত্তি পূজা করা হ'ত। মানুষ যে এরকম সব বিকট আকৃতির পশুর পূজা কেন আরম্ভ ক'রেছিল বুঝা মুস্কিল। যে মূর্ত্তি পূজা করা হবে তাকে তো সুশ্রী সুন্দর ক'রে তৈরী কর্‌লেই হয়। কিন্তু হয়তো, তা'দের ধারণা ছিল, দেবতারা তো ভয়ের জিনিষ, কাজেই তাদের মূর্ত্তিও হওয়া চাই সব ভয়ঙ্কর আকারের।

আজকাল বেশীর ভাগ মানুষেরই ধারণা এক ঈশ্বর, এক পরমশক্তি, কিন্তু সেই দিনের লোকের হয়তো ঈশ্বর সম্বন্ধে এই রকম ধারণা ছিল না। তা'দের ধারণা ছিল, অনেকগুলি দেব-দেবী রয়েছে আর মাঝে মাঝে তারা ঝগড়াঝাটিও করে। ভিন্ন ভিন্ন নগর আর ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন দেবতার পূজা হ'ত।

মন্দিরগুলি স্ত্রী পুরুষ দুই রকমের পুরুতেই ভরা ছিল।

লেখাপড়া এই শ্রেণীর লোকেরাই বেশী জান্‌ত, কাজেই অন্যদের চেয়ে তারাই ছিল বেশী জ্ঞানী। এরাই রাজাদের মন্ত্রী হ'ত। সেই দিনে পুরুতেরাই বই লিখ্‌তেন আর বই নকল কর্‌তেন। তা'দের বিদ্যা ছিল, কাজেই এই পুরুতেরাই ছিল প্রাচীন-যুগের জ্ঞানীসম্প্রদায়। চিকিৎসকও তারাই ছিল। তা'রা যে কত বড় বুদ্ধিমান তাই দেখাবার জন্য আবার মাঝে মাঝে সাধারণ লোকদের কয়েকটা চাতুরী দেখিয়ে ভক্তি আকর্ষণ ক'র্‌ত। সাধারণ লোক তো ছিল সাদাসিধা সরল প্রকৃতির; কাজেই পুরুতদের এরা মনে ক'র্‌ত যাদুকর, আর তা'দের ভয়ও ক'র্‌ত খুব।

পুরুতেরা সাধারণ লোকদের জীবনের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্‌ত। তারাই ছিল জ্ঞানী, কাজেই বিপদে পড়্‌লে, ব্যারাম হ'লে সকলেই তাদের কাছে যেত। সাধারণের জন্য বড় বড় উৎসবের অনুষ্ঠান এরাই ক'র্‌ত। সেই দিনে, সাধারণের ব্যবহারের জন্য কোন পঞ্জিকা ছিল না। এই সব উৎসবের দ্বারাই তাদের দিন গুণ্‌তি হ'ত।

পুরুতেরা যদিও অনেক সময়েই সাধারণ লোকদের ঠকিয়ে ভুল পথে নিয়ে যেত, কিন্তু আবার এদের সাহায্যও ক'র্‌ত, উন্নতির পথে নিয়ে যাবার চেষ্টাও ক'র্‌ত।

মানুষ যখন সহর গ'ড়ে প্রথম বসবাস সুরু করেছিল, কোন কোন দেশের শাসনের কাজটা রাজার দ্বারা না হ'য়ে পুরুতের দ্বারাই হ'ত। তারপর, রাজা ক্রমে পুরুতের জায়গা দখল

ক'র্‌ল, কারণ, যুদ্ধ ক'র্‌তে রাজাই ছিল বেশী পটু। কোন কোন দেশে রাজা আর পুরুত ছিল একই ব্যক্তি, যেমন মিশরের ফারোরা। ফারোদের জীবিত অবস্থায় মিশরীরা এদের মনে ক'রত নর-দেবতা। আর যখন ম'রে যেত তখন তো দেবতা বলেই তাদের পূজা করা হ'ত।

ছাব্বিশের চিঠি

কথা কও কথা কও অনাদি অতীত।

আমার চিঠি পড়্‌তে পড়্‌তে এবার তোমার নিশ্চয়ই বিরক্তি ধ'রে গেচে। এখন তোমার একটু বিশ্রামের দরকার। আচ্ছা, কয়েকদিন তোমাকে আর নূতন কিছু লিখ্‌ব না। এতদিনে যা যা লিখেচি, সেটাই আরেকবার ভেবে দেখ। লক্ষ লক্ষ বছরের কাহিনী তো তোমাকে কয়েকখানা চিঠির পাতায় শেষ ক'রে দিয়েচি। পৃথিবীটা যে দিন সূর্য্যের একটুখানি অংশ ছিল, সে দিন থেকে আরম্ভ ক'রে পৃথিবীটা সূর্য্যের গা থেকে কেমন ক'রে আল্‌গা হ'য়ে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হ'তে লাগ্‌ল সে কথা বলেচি। আবার পৃথিবীর গা থেকে চন্দ্রটাও একদিন আল্‌গা হ'য়ে গেল। বহুযুগ পর্য্যন্ত পৃথিবীর বুকে প্রাণের চিহ্ন ছিল না। তারপর কত লক্ষ কত কোটী বর্ষ ধ'রে ধীরে ধীরে জীবসৃষ্টি হ'তে লাগ্‌ল। লক্ষ কোটী বর্ষ! ধারণা হয় তোমার? এর ধারণা করা খুবই কঠিন। সবে তো তোমার বয়স দশ বছর, কিন্তু মস্ত বড়টী হ'য়ে গেছ ত! বাস্‌রে, একেবারে Young lady! একশো বছর তো তোমার কাছে অ-নে-ক কাল—তার পর হাজার বছর—তার পর হাজারের একশো গুণ হ'ল লক্ষ, তার পর লক্ষের একশো গুণ হ'ল কোটী। থাক্, তোমার ছোট্ট মাথায় হয়তো ভাল ক'রে ঢুক্‌চে না।

কিরাটোসোরাস্।

সরীসৃপ জাতীয় এই অতিকায় জানোয়ারটা কত বড় জান? মাটী থেকে ঘাড় পর্য্যন্ত এর উচ্চতা ৮ ফিট। বহু লক্ষ বছর আগে, মানুষ জন্মাবার বহুপূর্ব্বে এরকম সব প্রাণীই ছিল পৃথিবীর বাসিন্দা, এদের অস্তিত্ব এখন লোপ পেয়ে গেছে।

নিজেদের তো আমরা মনে করি মস্ত কেউকেটা, ছোটর উপর আমাদের কত ঘৃণা, তার কথা শুন্‌তে আমাদের ভালই লাগে না। কিন্তু পৃথিবীর অনন্ত কালের ইতিহাসের মধ্যে আমাদের ছোটখাট জীবনের ঘটনার মূল্যই বা কতটুকু বলত? যুগ-যুগান্তের ইতিহাসটা নিয়ে আমাদের একটু আলোচনা করা ভাল, এর শিক্ষাটা গ্রহণ কর্‌তে পার্‌লে, ছোটকে আর ছোট বলে মনে হবে না।

মনে কর তো সেই অনন্ত যুগের কথা, যখন পৃথিবীতে কোন প্রাণীর চিহ্ন ছিল না, তারপর আরেক অনন্ত যুগ যখন পৃথিবীতে কেবল সামুদ্রিক প্রাণীই রয়েছে—মানুষ নাই। তার পর বহু যুগ ধ'রে আরো নানা রকমের প্রাণীর সৃষ্টি হ'ল, তারা লক্ষ লক্ষ বছর ধ'রে পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াল, মানুষের হাতে গুলি খেয়ে কিন্তু কাউকে সে দিন প্রাণ হারাতে হয় নি।

তারও পর মানুষের জন্ম হ'ল--পৃথিবীর ছোটখাট একটা ক্ষুদে প্রাণী, সবচেয়ে তুর্ব্বল। অনেক হাজার বছর কেটে গেচে, মানুষের শক্তি আর বুদ্ধি আস্তে আঁস্তে বেড়েচে, আর আজ সে দেখ পৃথিবীর সব প্রাণীর প্রভু; সব প্রাণীই তার হুকুমের তাবেদার।

এর পর আস্তে আস্তে সভ্যতার পরিণতি। এর প্রথম সূচনাটার কথা তোমাকে বলেচি, পরের অবস্থাটা তোমাকে এখন বল্‌ব। এখন আর লক্ষ লক্ষ বছরের কথা বল্‌ব না। চিঠিতে যে সময়ে এসে পৌঁচেছি, সেটা চার পাঁচ হাজার বছর আগের

কথা। যে লক্ষ লক্ষ বছরের ইতিহাস তোমাকে আগে বলেচি, তার চেয়ে, এই চার পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসটা আমাদের ভাল জানা আছে। মানুষের ইতিহাস আর তার উন্নতি এই চার পাঁচ হাজার বছরের মধ্যেই গ'ড়ে উঠেচে। বড় হ'য়ে এই ইতিহাসটা তুমি ভাল ক'রে পড়্বে। এই ছোট্ট পৃথিবীর মানুষগুলির কেমন ক'রে কি হ'ল তারই একটু ধারণার জন্য তোমাকে অল্প কিছু লিখ্ব।

চারা গাছের ফসিল।

কে জানে, কত লক্ষ বছর আগে একটা নরম মাটির স্তরের উপর একটা পাতা বা চারা গাছের ছাপ পড়েছিল। মাটিটা শক্ত হ'তে হ'তে আজ পাথর হ'য়ে গেছে, আর সেই ছাপটা আজ পর্য্যন্তও পাথরের গায় তেমন ঠিক রয়েছে।

সাতাশের চিঠি

ফসিল্ (FOSSIL.)

কয়েকখানা ছবির পোষ্টকার্ড পাঠাচ্চি তোমাকে। আমার বড় বড় নীরস চিঠিগুলি পড়ার চেয়ে ছবিগুলি দেখে হয়ত তুমি বেশী আনন্দ পাবে। এই কার্ডগুলি লণ্ডনের সাউথ কেন্‌সিংটন মিউসিয়মের কতকগুলি মাছের ফসিলের ছবি। এই ফসিল (fossil) গুলি তুমি সেখানে দেখেচ। তা হউক, এই ছবিগুলি দেখেও আদিম যুগের মাছের ফসিলগুলি কেমন সব দেখ্‌তে, সেই সম্বন্ধে তোমার ধারণা হবে।

ফসিলের কথা তোমাকে এর আগেই বলেচি, এগুলি হ'ল, প্রাচীন যুগের প্রাণী-দেহের অথবা চারা গাছের লুপ্তাবশেষ। পাহাড়ে এবং অন্যান্য জায়গায় এগুলি পাওয়া যায়। মৃত্যুর পর প্রাণীদেহের নরম অংশটা শীঘ্রই নষ্ট হ'য়ে গেল, কিন্তু হাড় এবং শরীরের অন্যান্য শক্ত অংশগুলি বহুকাল ধ'রে টিকে রইল। ও-গুলি সমুদ্রের তলায় নরম কাদা· মাটীর নীচে ঢাকা প'ড়ে রক্ষিত ছিল। সময়ে নরম মাটীটা শক্ত হ'য়ে গেল; আর সমুদ্রের নীচে বহু যুগ ধ'রে কাঁদা মাটী সঞ্চিত হওয়ায় সমুদ্রের তলাটা আস্তে আস্তে উপরে উঠে আস্‌ল, আর তার থেকেই ডাঙ্গার সৃষ্টি হ'ল। কাজেই সেই যুগের সব সামুদ্রিক প্রাণীর

ফসিলগুলি আমরা আজকাল শুক্‌নো ডাঙ্গাতেই পাই। পাথরের গায় এই ফসিলগুলিকে যে অবস্থায় পাওয়া গেছে, ছবিতে তাই দেখান হয়েচে ; তাই খুব পরিষ্কার বুঝা যাচ্চে না। এর মধ্যে দু'টা হাতে তৈরী নকল, অর্থাৎ আসল ফসিলের অনুকরণে তৈরী হয়েছে

আমার কাছে কিন্তু G24 এবং G27 এই দু'টাই খুব ভাল লাগে। একটাতে কেবল মাছের দাঁতগুলিই দেখা যাচ্চে। পাথরের গায়, বহুযুগ আগে ম'রে যাওয়া মাছগুলি, কেমন ক'রে তাদের চিহ্ন রেখে গেচে, তা' পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ বছর পরে আজ আমরা এই চিহ্ন দেখেই, তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাচ্চি।

ছবিগুলি আর সঙ্গের যে কাগজখানায় এদের বর্ণনা র'য়েছে তা' এনভেলপে পূ'রে রেখে দিয়ো, সব জিনিষের সাথে মিশিয়ে ফেল' না যেন।

মাছের ফসিল্।

এই ফসিলটার মধ্যে মাছটার দাঁতগুলিই কেবল দেখা যাচ্ছে

অতীতের স্মৃতি।

অনেক দিন তোমাকে চিঠি লিখি নাই। এর আগের দু'খানা চিঠিতে আমাদের সেই প্রাচীন যুগের কাহিনী, যা' তোমাকে আগে লিখেচি, তাই আবার ফিরে আলোচনা করেচি। ফসিলগুলি যে দেখ্‌তে কেমন তাই বুঝাবার জন্য মাছের ফসিলের কয়েকখানা ছবির পোষ্টকার্ডও তোমাকে পাঠিয়েছিলাম। মুসৌরীতে যখন তোমার কাছে গিয়েছিলাম, তখন আরও কতকগুলি ফসিলেরর ছবিও তোমাকে দেখিয়েচি।

কতকগুলি সরীসৃপের ফসিলের কথা হয়তো তোমার বিশেষ ক'রে মনে আছে। সরীসৃপ কাকে বলে জান ত? যে সব প্রাণী বুকে হাটে তাদেরই সরীসৃপ বলে, যেমন—আজকালকার দিনের সাপ, গিরগিটি, কুমীর, কচ্ছপ ইত্যাদি। প্রাচীন যুগের সরীসৃপগুলিও এই পরিবারেরই ছিল, কিন্তু চেহারাটা মোটেই এখনকারগুলির মত ছিল না, আকৃতিতে ছিল আরো অনেক বেশী বড়। সাউথ কেন্‌সিংটন মিউসিয়মে যে সেই প্রাচীন যুগের অতিকায় জানোয়ারগুলি দেখেচ, তোমার মনে আছে বোধ হয়। এর একটা তো ছিল ৩০।৪০ ফিট লম্বা। একটা ব্যাং ছিল মানুষের চেয়েও বড়, আর একটা কচ্ছপও

ছিল প্রায় মানুষের মতই বড়। মস্ত মস্ত সব বাদুর সে দিনে উড়ে বেড়াত। আরেকটা জন্তু ছিল, নাম তার ইগুয়ানোডন (Iguanodon)। ওটা যখন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াত, তখন একটা ছোট গাছের সমান উঁচু হ'ত।

প্রাচীন দিনের চারা গাছের ফসিলও তুমি দেখেচ। পাষাণের গায়, পাতা, ফার্ণ এ সবের ছাপ আজও রয়ে গেচে। কবে জানি, কত লক্ষ বছর আগে, একটা নরম মাটীর স্তরের উপর একটা পাতার ছাপ পড়েছিল, মাটীটা শক্ত হ'য়ে হ'য়ে আজ পাথর হ'য়ে গেচে, আর সেই ছাপটা আজ পর্যন্তও অমনি পাথরের গায় রয়ে গেচে।

সরীসৃপের বহু পরে, স্তন্যপায়ী জন্তুর সৃষ্টি হয়েচে। এরা এদের সন্তানদের বুকের দুধ দেয়। আমাদের চারিদিকে যে সব জন্তু দেখ্চ তার বেশীর ভাগই, আর আমরাও স্তন্যপায়ী। প্রাচীন যুগের স্তন্যপায়ী জন্তুগুলি, আর এখনকার দিনের গুলির মধ্যে তফাৎ বিশেষ কিছু নেই। ও-গুলি অবশ্য অনেক বড় ছিল, তবে সরীসৃপগুলির মত অত বড় নয়। খুব মস্ত মস্ত দাঁতওয়ালা সব হাতী ছিল, আর শূকরগুলিও ছিল খুব বড়।

মানুষের ফসিল্ও তুমি দেখেছ, তবে ঐগুলি বেশীর ভাগই ছিল কঙ্কাল, অস্থি আর মাথার খুলি। কাজেই ঐগুলি হয়তো তোমার খুব ভাল লাগে নাই। প্রস্তর যুগের মানুষের তৈরী পাথরের অস্ত্রগুলি দেখ্তে তোমার নিশ্চয়ই খুব ভাল লেগেছিল।

মিশরের মামি আর কতকগুলি সমাধি মন্দিরের ছবিও

ইগুয়ানোডন।

অধুনা-লুপ্ত সরীসৃপ জাতীয় এই জানোয়ারটা এত বড় ছিল যে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালে এটা প্রায় একটা ছোট গাছের সমান উঁচু হ'ত। মাটী থেকে ঘাড় পর্য্যন্ত এর উচ্চতা ১০ ফিট। এর ফসিল্‌টা আবিষ্কৃত হয়েছে, তার থেকেই এর আকৃতিটা পরিকল্পিত হয়েছে।

তোমাকে দেখিয়েচি। এর কয়েকটা ত খুবই সুন্দর ছিল, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। কাঠের শবাধারগুলি চিত্রিত ছিল মানুষের জীবনের বিস্তৃত কাহিনী দিয়ে। মিশরের থিব্‌স নগরের কয়েকটা কবরের কতকগুলি দেয়াল চিত্রও খুবই সুন্দর ছিল।

এই থিব্‌সের অনেক প্রাসাদ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের চিহ্নও তুমি দেখেচ। সেগুলি ছিল মস্ত মস্ত থামওয়ালা একেকটা বিশাল দালান।

থিব্‌সের নিকটেই মেমনের বিশাল প্রস্তর মূর্ত্তি, একে বলা হয় Colossus of Memmon.

উচ্চ মিশরের অন্তঃপাতি কর্ণাক নগরের অনেক ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির এবং দালানের ছবিও তুমি দেখেচ। এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত চিহ্নগুলি দেখেও তুমি কতকটা আঁচ কর্‌তে পার্‌বে প্রাচীন মিশরীরা স্থপতিবিদ্যায় কত উন্নত ছিল। খুব ভাল ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান না থাক্‌লে এত বড় বড় বাড়ী, মন্দির তৈরী করা কিছুতেই সম্ভব হ'ত না।

পেছন ফিরে যতটুকু দেখবার দেখে নিয়েচি, এবার চল আরেকটু এগিয়ে যাই।

ভারতে আর্য্য জাতি।

এ পর্য্যন্ত কেবল বহু প্রাচীন যুগের কাহিনীই বলে এসেচি। এখন দেখব মানুষ কেমন ক'রে উন্নতি কর্‌ল, আর কি কি কাজ করেছিল। যে সময়ের কথা এর আগ পর্য্যন্ত বলেছি তাকে বলা যায় প্রাগ্-ঐতিহাসিক অর্থাৎ ইতিহাস আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেকার; কেন না, ঐ সময়কার ঠিক ঠিক কোন ইতিহাস আমাদের জানা নেই, অনেক কিছুই অনুমান ক'রে বল্‌তে হয়। এখন আমরা ইতিহাসের একপ্রান্ত সীমায় এসে পৌঁচেছি।

ভারতবর্ষে কি ঘটেছিল তাই প্রথম দেখা যাক্। আমরা জানি, প্রাচীন যুগে মিশরের মত ভারতবর্ষেরও একটা সভ্যতা ছিল, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচলন ছিল, জাহাজে ক'রে ভারতবর্ষের মাল, মিশর, মেসোপোটামিয়া এবং অন্যান্য দেশে পাঠান হ'ত। সেই যুগে ভারতবর্ষে যারা বাস ক'র্‌ত তারা হ'ল দ্রাবীড় জাতি। দক্ষিণ ভারতে, আর মাদ্রাজের চারদিকে যে সব লোক বাস করে তারা এই দ্রাবীড়দেরই বংশধর।

উত্তরদিক থেকে আর্য্যরা এসে এই দ্রাবীড়দের আক্রমণ ক'রেছিল। মধ্য এসিয়ায় আর্য্যদের সংখ্যা এক সময় খুব বেড়ে গেল, এবং খাদ্যেরও টান প'ড়ে গেল। তারা তখন চারদিকে

The Colossus of Memmon at Thebes.

ছড়িয়ে পড়্‌ল। তাদের মধ্যে বহু সংখ্যক, পারস্য, গ্রীস্‌ এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে চলে গেল। কাশ্মীরের পাহাড় ডিঙ্গিয়ে দলে দলে তারা ভারতবর্ষেও এসে উপস্থিত হ'ল।

আর্য্যগণ খুব শক্তিশালী যোদ্ধা ছিল, কাজেই দ্রাবীড়দের তারা সাম্‌নে তাড়িয়ে নিয়ে চল্‌ল। যেন একটী ঢেউএর পর আরেকটী, এম্‌নি ক'রেই তারা উত্তর পশ্চিম কোণ দিয়ে ভারতবর্ষে ঢুকতে লাগল। দ্রাবীড়েরা হয়তো প্রথম প্রথম তাদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আর্য্যদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগ্‌ল, কাজেই তাদের আর বেশী দিন প্রতিরোধ করা চল্‌ল না। বহু কাল, আর্য্যরা উত্তরদিকে পাঞ্জাব এবং আফগানিস্থানের মধ্যেই র'য়ে গেল। তারপর আস্তে আস্তে তারা নীচে বর্ত্তমান যুক্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত নেমে আস্‌ল। শেষ পর্য্যন্ত তারা মধ্য ভারতের বিন্ধ্য পর্ব্বত পর্য্যন্তও ছড়িয়ে পড়্‌ল। এই বিন্ধ্য পর্ব্বত ছিল ঘন বনে ঢাকা, কাজেই বিন্ধ্য পার হ'য়ে যাওয়ার আর সুবিধা হ'ল না। বহু দিন ধ'রে আর্য্যরা বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরদিকেই র'য়ে গেল। কেহ কেহ অবশ্য পাহাড় ডিঙ্গিয়ে ওদিকেও চলে গেল, কিন্তু দল বেঁধে যাওয়া সম্ভব হয় নাই, কাজেই দক্ষিণ দিকটা বেশীর ভাগ দ্রাবীড়দেরই র'য়ে গেল।

ভারতে আর্য্যদের আগমন কাহিনী প'ড়ে, তুমি খুব আনন্দ পাবে। আমাদের পুরাতন সংস্কৃত বইগুলি থেকে এই বিষয়ে অনেক কিছু জানা যায়। বেদের মত কয়েকখানা বই এই সময়েই রচিত

হ'য়েছিল। ঋগ্বেদ হ'ল সবচেয়ে প্রাচীন। ঐ সময় ভারতবর্ষের যে অংশটা আর্য্যদের অধিকারে ছিল, ঋগ্বেদে সেই দেশটার বর্ণনা র'য়েচে। অপর কয়েকখানা বেদ, এবং পুরাণের মত কয়েকখানা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকেও, আর্য্যদের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার কাহিনী জানা যায়। এই প্রাচীন গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে তোমার হয়তো খুব বেশী ধারণা নেই। তুমি বড় হ'য়ে এ সম্বন্ধে আরো অনেক জান্‌বে। কিন্তু পুরাণের অনেক গল্প ত তুমি এর মধ্যেই শিখেচ। এর অনেক পরে রামায়ণ আর তারও পরে মহাভারত রচিত হ'য়েচে।

এই সব গ্রন্থ থেকে আমরা জান্‌তে পারি, আর্য্যরা যখন কেবল পাঞ্জাব এবং আফগানিস্থানেই বাস ক'র্‌ত, সেই দেশটার নাম তারা রেখেছিল 'ব্রহ্মাবর্ত্ত', আফগানিস্থানকে বলা হ'ত গান্ধার। মহাভারতের গান্ধারী দেবীর নাম মনে আছে ত? তিনি গান্ধার দেশ থেকে এসেছিলেন ব'লে তাঁর ঐ নাম হয়েছিল। আফগানিস্থান অবশ্য আজ আমাদের ভারতবর্ষ থেকে ভিন্ন হ'য়ে গেচে, কিন্তু সেই দিনে ভারতবর্ষের সাথে এক ছিল।

আর্য্যরা যখন ক্রমে ক্রমে আরো নীচে, গঙ্গা এবং যমুনার উপত্যকা ভূমিতে এসে পড়্‌ল, তখন সমস্ত উত্তর ভারতকে তাঁরা বল্‌তেন আর্য্যাবর্ত্ত।

অন্যান্য দেশের প্রাচীন জাতিগুলির মতই তাঁরাও নদীর তীরেই বসবাস আরম্ভ ক'র্‌ল। কাশী, প্রয়াগ আর এম্‌নি আরো অনেক প্রসিদ্ধ নগর নদীর তীরেই অবস্থিত।

ত্রিশের চিঠি

ভারতীয় আর্য্যগণ কেমন ছিলেন ?

পাঁচ ছয় হাজার বছর, হয়তো বা তারও আগে, আর্য্যরা প্রথম ভারতবর্ষে আগমন করে। অবশ্য সবাই মিলে দল বেঁধে একসঙ্গে আসে নাই। একটি বাহিনীর পর আরেকটী, একটি দলের পর আরেকটী, একটি পরিবারের পর আরেকটী, এম্‌নি ক'রেই তারা শত শত বর্ষ ধ'রে ভারতবর্ষে ঢুকেছিল। সে দিনের কথা আজ একটু কল্পনা ক'রে দেখ—মস্ত দল বেঁধে তাদের পথ চলা সুরু হয়েচে, গৃহস্থালীর জিনিষপত্র সব গাড়ী নয়তো গরুর পিঠে বোঝাই ক'রে তারা সাথে সাথে চলেচে। আজকালকার পর্য্যটক অথবা টুরিষ্টদের মত ভ্রমণ উদ্দেশ্যে তাদের আগমন নয়, পেছন ফিরবার তাদের উপায় ছিল না। তারা এসেছিল চির-জীবন বসবাস কর্‌বার জন্য, নয়তো যুদ্ধ ক'রে মর্‌তে। তোমাকে ত বলেচি, তাদের বেশীর ভাগই এসেছিল উত্তর-পশ্চিম কোণের পাহাড় ডিঙ্গিয়ে। কেহ হয়তো বা সমুদ্রপথে তাদের ছোট ছোট জাহাজে চ'ড়ে পারস্য উপসাগর দিয়ে, একেবারে সিন্ধুর বুক বেয়ে উপরে উঠে এসেছিল।

এই আর্য্যজাতির লোকেরা কেমন ছিল ? তাদের লেখা বই প'ড়ে অনেক কথাই জানা যায়। এই বইগুলির মধ্যে কয়েক-

খানা, যেমন বেদ চারখানা, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন বই। প্রথমেই, এগুলি লেখা হয় নাই; বইগুলি মুখস্থ ক'রে রাখা হ'ত এবং অন্যের কাছে গান গেয়ে শুনান হ'ত। এই বেদের রচনা এত সুন্দর যে প্রায় গানের সুরেই এদের পাঠ করা চলে।

কোন সুকণ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের মুখে বেদ গান বড় মধুর শুনায়। বেদ হিন্দুদের অতি পবিত্র গ্রন্থ। কিন্তু 'বেদ' শব্দের অর্থ কি জান? 'বেদ' অর্থ জ্ঞান। সেই প্রাচীন যুগের মুনি-ঋষিরা যেই জ্ঞান অর্জ্জন ক'রেছিলেন তাই বেদের মধ্যে রয়েচে। সেই দিনে অবশ্য রেলগাড়ী, সিনেমা, টেলিগ্রাফ এসব ছিল না, কিন্তু তাই ব'লে যে তারা জ্ঞানী ছিলেন না, তা মনে করো না। কারো কারোর ধারণা সেই যুগের জ্ঞানী লোকেরা আজকের যে কোন লোকের চেয়ে বেশী জ্ঞানী ছিলেন। তা যা-ই হউক, তাঁরা এমন সব সুন্দর সুন্দর বই লিখে গেচেন, যে আজ পর্য্যন্তও সে সব বইয়ের আদর লোকে করে, এতেই বুঝবে সেই প্রাচীন যুগের লোকেরা কত শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

তোমাকে বলেচি, এই বেদগ্রন্থ প্রথমেই লেখা হয় নাই। সমস্ত বইগুলি মুখস্থ ক'রে রাখা হ'ত, আর তাই পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে চলে আস্‌ত। মনে ক'রে রাখবার কি অদ্ভুত শক্তি! এই যুগের কয়জন লোক সমস্ত বই মুখস্থ ক'রে রাখতে পারে?

যে যুগে বেদ রচিত হয়েচে, তাকে বলে বৈদিক যুগ।

চারখানা বেদের প্রথম খানা ঋগ্বেদ। এই সমস্ত ঋগ্বেদখানাই কতকগুলি স্তোত্র আর গানে ভরা, প্রাচীন আর্য্যগণ এই স্তোত্র-গুলি গান কর্‌তেন। ভারী আমুদে প্রকৃতির লোক ছিলেন এঁরা, মুখ ভার করে থাক্‌তেন না মোটেই, জীবন ছিল তাঁদের আনন্দে ভরা, প্রকৃতি ছিল বেপরোয়া। মনের আনন্দে তাঁরা সুন্দর সুন্দর গান রচনা কর্‌তেন, আর আরাধ্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে সেই গান গাইতেন।

নিজেদের সম্বন্ধে আর তাদের জাতের সম্বন্ধে তাদের আর গর্ব্বের অবধি ছিল না। আর্য্য শব্দটীর মানেই কিন্তু ভদ্রলোক, অর্থাৎ একজন বিশিষ্ট লোক। স্বাধীনতা তাঁরা ভালবাসতেন খুব। তাঁদেরই ভারতবর্ষের বংশধর আমরা, আজ সাহসহীন, স্বাধীনতা হারা। কিন্তু, তবু আমাদের মনে দুঃখ নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কিন্তু এরকম ছিলেন না। প্রাচীন আর্য্যরা অসম্মান আর দাসত্বের চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয়ঃ মনে কর্‌তেন।

তাঁরা মস্ত যোদ্ধা ছিলেন, বিজ্ঞানের জ্ঞানও তাঁদের ছিল, আর কৃষিবিদ্যার জ্ঞান ত খুব বেশী-ই ছিল। স্বভাবতঃই তাঁরা কৃষিবিদ্যাকেই বড় বলে মনে কর্‌তেন, আর যাদের কাছ থেকে কৃষির সাহায্য পেতেন তাদের মূল্যও বুঝতেন। নদী ছিল তাদের জলদাতৃ, কাজেই নদীকে তারা ভালবাসতেন, আর নদীকে মনে কর্‌তেন তাদের উপকারী বন্ধু। ষাঁড়, গরু এরাও তাদের কৃষির সাহায্য কর্‌ত, তাদের নিত্যকার জীবন যাত্রার বন্ধু ছিল। গরু তাদের দুধ দিত, আর দুধ তাদের খুব প্রয়োজনীয়ও ছিল।

কাজেই এই পশুগুলির তারা যত্ন কর্‌তেন, তাদের প্রশংসা ক'রে গান গাইতেন। বহুদিন পরে, এদেশে মানুষ কিন্তু গরুকে যত্ন কর্‌বার আসল কারণটা ভুলে, গরুকে পূজা করাই আরম্ভ ক'রে দিল, যেন এতেই তাদের মস্ত উপকার হবে।

আর্য্যরা ছিলেন ভয়ানক গর্ব্বিত, কাজেই তাদের ভয় ছিল, ভারতবর্ষের অন্যান্য সব জাতির সাথে পাছে তারা মিশে যান। কাজেই তাঁরা বিধিবিধান দ্বারা এই মিশ্রণটা বন্ধ ক'র্‌তে চেয়েছিলেন, যাতে আর্য্যরা অন্যদের বিবাহ না ক'র্‌তে পারে। বহু প'রে, ঐ বিধির জোরেই আজকের দিনের জাতিভেদের সৃষ্টি হয়েচে। আজকাল ত এই জাতি ভেদ একটা মস্ত প্রহসন হ'য়ে দাঁড়িয়েচে। এমন অনেক আছে, যারা অন্যকে স্পর্শ কর্‌বার, অথবা অন্যের সাথে আহারের কথায় আৎকে উঠে। সুখের বিষয় এই অদ্ভুত প্রথাটা ক্রমেই কমে আস্‌চে।

রামায়ণ ও মহাভারত।

বেদ রচনার সময়কে বৈদিক যুগ বলা হয়। এই বৈদিক যুগের পরই হ'ল মহাকাব্যের যুগ, এই সময়ই দুইখানা মহাকাব্য—খুব মস্ত কবিতায় বড় বড় বীরপুরুষদের কাহিনী—লেখা হয়েছিল। এই দুইখানা মহাকাব্য হ'ল রামায়ণ ও মহাভারত।

এই মহাকাব্যের যুগে আর্য্যরা বিন্ধ্য পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারতে ছড়িয়ে প'ড়েছিল। তোমাকে ত আগেই বলেছি এই দেশটাকে আর্য্যাবর্ত্ত বলা হ'ত। এখনকার যুক্তপ্রদেশকে বলা হ'ত 'মধ্যদেশ', বাঙ্গালাকে বলা হ'ত 'বঙ্গ'।

এখন তোমাকে একটা মজার কথা বলব। ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা দেখ, আর হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের মাঝের যে ভূখণ্ডকে আর্য্যাবর্ত্ত বলা হ'ত তাই একবার মনে মনে ভেবে নাও। দেখ্‌বে এই অংশটাকে মনে হবে যেন একটি অর্দ্ধচন্দ্র। কাজেই আর্য্যাবর্ত্তকে বলা হ'ত ইন্দুদেশ—ইন্দু মানে চন্দ্র।

আর্য্যরা কিন্তু এই অর্দ্ধচন্দ্রাকারটী বড়ই ভালবাসতেন। অর্দ্ধচন্দ্রাকারের সব দেশকেই তাঁরা খুব পবিত্র মনে ক'র্‌তেন। বারাণসীর মত অনেক তীর্থ স্থানই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। তোমার জানা আছে কি না ব'ল্‌তে পারি না, গঙ্গা কিন্তু এলাহাবাদকেও অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে আছে।

রামায়ণের কথাত জানই—এ হ'ল রামচন্দ্র ও সীতা দেবীর কাহিনী, রামের সাথে লঙ্কার রাজা রাবণের যুদ্ধ। লঙ্কা হ'ল এখনকার সিংহল (Ceylone)। মূল কাব্যখানা লিখেছেন বাল্মিকী, সংস্কৃত ভাষায়। অন্যান্য ভাষায় এর পরে আরো কয়েকখানা রামায়ণ লেখা হয়েচে। তুলসীদাসের হিন্দি রামায়ণখানাই সব চেয়ে সুন্দর, এর নাম 'রামচরিত-মানস'।

দক্ষিণ ভারতের বানরেরা না-কি রামচন্দ্রকে যুদ্ধে সাহায্য করেছিল, হনুমান ছিল বানরদের মধ্যে সেরা বীর। হয়তো রামায়ণের গল্পটা হ'ল আর্য্যদের সাথে দক্ষিণ ভারতের লোকদের যুদ্ধ, ওদের রাজার নাম ছিল রাবণ। দক্ষিণ ভারতের একদল কৃষ্ণকায় লোকদেরই হয়তো 'বানর' আখ্যা দেওয়া হয়েচে।

রামায়ণে যে কত সুন্দর সুন্দর গল্প আছে, এখানে আর সে সব বলা চল্‌বে না। তুমি নিজেই সেই সব পড়্‌বে।

মহাভারত, রামায়ণের অনেক পরে লেখা হয়েচে। রামায়ণের চেয়ে এখানা আরো বড় গ্রন্থ। মহাভারতের যুদ্ধ কিন্তু আর্য্যদের সাথে দ্রাবীড়দের যুদ্ধ নয়—আর্য্যদের সাথে আর্য্যদের যুদ্ধ।

যুদ্ধের কথা ছেড়েই দাও, তা ছাড়াও বইখানা অতি চমৎকার। বইখানা মহান আদর্শ ও উপদেশপূর্ণ কাহিনীতে ভরা। এই বইখানা যে আমাদের এত প্রিয় তার সব চেয়ে বড় কারণ কবিতার মাণিক ভগবদ্গীতা এই মহাভারতের মধ্যেই রয়েচে।

এই বইগুলি বহু সহস্র বছর আগে ভারতবর্ষে রচিত হয়েছিল। এমন সব বই যারা লিখেছিলেন তারা নিশ্চয়ই মহাজ্ঞানী ছিলেন। বহু সহস্র বছর আগে লেখা হ'লেও কিন্তু বইগুলি আজও ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত হয় নাই, প্রত্যেক শিশু এদের কথা জানে, প্রত্যেক বয়স্ক লোক এদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়।